শুভ নববর্ষ ১৪২২
সংকলন
রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-০৪ ।
বৈশাখ ১৪২২ । এপ্রিল ২০১৫ । রজব ১৪৩৬ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা
নববর্ষে অঙ্গিকার
অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা
সন্ত্রাসবাদসহ যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে
ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ দেশ গড়ি
১লা বৈশাখ ও নবান্ন বে'দাত না এবাদত?
দৈনিক বজ্রশক্তি
সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর
মানবতার কল্যাণে ধর্ম
শান্তির জন্য সংস্কৃতি
এক জমজমাট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সম্পাদকীয়

সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

দুইশত বছর আমরা ব্রিটিশদের অধীন ছিলাম। তারা এ জাতিকে নিয়ে হাজারো ষড়যন্ত্রের খেলা খেলেছে, এ জাতির নৈতিক চরিত্র প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে, আমাদের সমুদয় সম্পদ হরণ করে যাওয়ার সময় আমাদের মধ্যে হাজারো বিভক্তি, রাজনীতিক বিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি সৃষ্টিকারী এমন একটা ব্যবস্থা (System) চাপিয়ে দিয়ে গেছে যেটা অনুসরণ করে আমরা নিত্য হানাহানি, দাঙ্গা ফাসাদ করে চলছি, আমাদের মধ্যে দেশপ্রেম, ভ্রাতৃত্ববোধ, জাতীয় ঐক্য দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। আমরা চোখের সামনে অপরাধ হতে দেখলেও বাধা দেই না, ভাবি, 'এগুলো দেখার দায়িত্ব তো আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। আমি কেন খামাখা নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাব।' আজকে আমাদের যে জাতীয় সংকট, তা এই আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার ফল। বর্তমানে আমরা যে সমস্যায় পড়েছি, যে সংকটে পড়েছি তা আমাদের জাতীয় সংকট। এই সংকট নিরসনে অন্তত দু'টি কারণে আমাদেরকে অবশ্যই সকল স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ছুঁড়ে ফেলে সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

(এক) এটা আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব: মোটামুটি আমরা সবাই আল্লাহ ও রসুলকে বিশ্বাস করি, পরকালকে বিশ্বাস করি, জান্নাতকে বিশ্বাস করি। আমরা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি পেতে চাই, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দায়িত্ব সমস্ত রকম সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, অন্যায়, অশান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানুষের শান্তিময় নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের ধারণা নামায, রোযা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ধর্ম কী? যে গুণ বা বৈশিষ্ট ধারণ করে আমরা সাধারণ একটি প্রাণীর স্তর থেকে মানুষে পরিণত হই তাই আমাদের ধর্ম। সেই গুণগুলি হলো মানবতা, মনুষ্যত্ব, দয়া। ইসলাম কী? ইসলাম শব্দের অর্থই শান্তি, অর্থাৎ মানুষের শান্তির লক্ষ্যে কাজ করাই ইসলামের মূল কাজ, এটাই এবাদত। এই কাজই করে গেছেন আল্লাহর সকল নবী রসুল ও মো'মেনগণ। এই এবাদত না করলে হাশরের দিন আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি মানুষকে অশান্তির আগুনে জ্বলতে দেখেও যারা কাপুরুষের মতো ঘরে লুকায় আর এবাদত মনে করে রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে, নানা উপাসনায় মশগুল থাকে তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। কাজেই এখন আমাদের প্রত্যেকের এবাদত, ধর্মীয় কর্তব্য, ঈমানী দায়িত্ব হলো এই অশান্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করা। তবেই আমাদের অন্যান্য আমল কবুলযোগ্য হবে।

(দুই) সামাজিক কর্তব্য: অনেকে আছেন যারা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্বাসগতভাবে প্রস্তুত নয়। তাদের প্রতি আমাদের কথা হলো, মানুষের নিরাপত্তাবিধানের জন্য এগিয়ে আসা এই মুহূর্তে আমাদের সকলের সামাজিক কর্তব্য। আমরা এই সমাজে বাস করছি, এই সমাজের অস্তিত্ব আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব, তাই এই সমাজের প্রতি, এই জাতির প্রতি আমরা আজন্ম ঋণী। আমরা এদেশের আলো বাতাসে, এই পদ্মা-মেঘনা-যমুনার অববাহিকায় বেড়ে উঠেছি। এদেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা নিয়েছি, দেশ ও সমাজের সেই ঋণ পরিশোধের সময় এসেছে। আজকে সমাজের মানুষ যখন অশান্তির মধ্যে আছে তখন তা থেকে সমাজের মানুষকে রক্ষা করা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। এই দায়িত্বকে যদি আমরা হেলাফেলা করি, তাহলে সেটা আত্মঘাতী ভুল হবে। কাজেই ধর্মীয় বা সামাজিক যে দৃষ্টিতেই দেখুন না কেন, আমরা যদি নিজেদেরকে মানুষ দাবি করি বা এ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করি তাহলে বসে থাকতে পারি না, আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল প্রকার অন্যায়, অসত্যের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে হবে, সাধ্যমতো ভূমিকা রাখতে হবে।

আমরা জাতির এই সংকটে এগিয়ে এসেছি। আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করে যাচ্ছি এই সংকট থেকে জাতিকে উদ্ধারের জন্য। পত্র-পত্রিকা, সংকলন, বই, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লিখে; সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, জনসভা, পথসভা ইত্যাদির মাধ্যমে রাজধানী শহর থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত আপামর জনসাধারণকে এই সত্যগুলি জানিয়ে সন্ত্রাস, সহিংসতা, জঙ্গিবাদ, ধর্মব্যবসাসহ সকল প্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানাচ্ছি। কিন্তু আমাদের এই স্বল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার দ্বারা এই বিশাল কাজ প্রায় অসম্ভব। এই কাজ আপনাদের। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি মাত্র। আপনারাই পারেন এই কাজের পরিণত রূপ দিতে। তবু যতদিন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অন্যায়-অবিচার, অশান্তি, হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি, রক্তপাত নির্মূল না হবে ততদিন আমাদের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে ইনশা'ল্লাহ। আমাদের এই সঙ্কলন এই অব্যাহত প্রচেষ্টারই অংশবিশেষ।

আমাদের মনে রাখা উচিত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষের কোনো এবাদতই কবুল হয় না, স্বার্থপর লোকের সমাজে বসবাস করার অধিকার নেই। যে শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সে তো পশু, মানুষ নয়।

সূচিপত্র

- *পহেলা বৈশাখ ও নবান্ন বে'দাত না এবাদত?- ২*
- *প্রকৃতি প্রগতিশীল তবে ধর্মে কেন স্থবিরতা? - ৬*
- *শান্ত-স্নিগ্ধ এদেশ, তাই প্রকৃতি তাদেরকে স্থায়ী হতে দেবে না - ৯*
- *পহেলা বৈশাখের মোড়কে রমরমা বাণিজ্য- ১০*
- *স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা- ১১*
- *জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা- ১৩*
- *এক মোহনায় ধর্ম, লালনগীতি ও চলচ্চিত্র- ১৬*
- *সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, অভিনয় গোনাহের কাজ নয়- ১৮*
- *সকল ধর্মের মূলমন্ত্র মানবতা সংস্কৃতি ও শিল্পকলা জাতীয় উন্নতির মানদণ্ড- ১৯*
- *ধর্ম মানুষকে শুদ্ধ করে অধর্ম মানুষকে নষ্ট করে- ১৯*
- *অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নারী- ২০*
- *সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ বানানোর চেয়ে বড় ইবাদত হলো নিরন্নকে অন্ন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান- ২৪*
- *শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয় কেন?- ২৬*
- *বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উৎস ও ফলাফল- ২৮*
- *ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকার- ২৯*
- *জাতিকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে- ৩১*

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা, ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স, ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৬৭৩-৯৯০৪৬৮, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৭৫৩-৯৯৭০০১, ০১১৯১-১০১৩২৪, ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

পহেলা বৈশাখ ও নবান্ন
বে'দাত না এবাদত?

মসীহ উর রহমান

আমাদের দেশের অনেক আলেম ও মুফতির দৃষ্টিতে চৈত্র সংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি উদ্‌যাপন করা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, শেরক ও বেদাত। তাদের জ্ঞানের প্রতি যথাযথ সম্মান রেখেই বলছি, এ বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ দ্বিমত রয়েছে। আমরা দুটি দিক থেকে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করছি, (ক) ইসলামের আকীদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে, (খ) শরিয়তের মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে।

(ক) ইসলামের আকীদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে:
আকীদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত হয়েছে। তাই এতে যে বিধানগুলো স্থান পেয়েছে সেগুলো কোনোটাই কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা বা আঞ্চলিকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এর সব বিধান সব মানুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য ও গ্রহণীয়। প্রতিটি জনপদের মানুষের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে যা তাদের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিশীল, যা গড়ে ওঠে হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে। তাই ইসলামে একটি বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে আরেকটি অঞ্চলের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয় নি, তেমনি কোনো এলাকার মানুষের আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে নিষিদ্ধও করা হয় নি। ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে কেবল অশ্লীলতা, অন্যায় ও আল্লাহর নাফরমানিকে। সেই বিচারে বাংলাদেশ ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলে আবহমান কাল থেকে চলে আসা নবান্ন উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তি বা পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি কোনো উৎসবই হারাম বা নিষিদ্ধ হতে পারে না। তবে এই উৎসবগুলোর নামে যদি অশ্লীলতা ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটানো হয়, সেটা অবশ্যই নিষিদ্ধ। কেননা তার দ্বারা মানবসমাজে অশান্তি সাধিত হবে এবং যা কিছুই অশান্তির কারণ তা-ই যে কোনো মানবকল্যাণকামী জীবনব্যবস্থায় নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে।

আল্লাহ এমন একটি জীবনবিধান দিয়েছেন যার নাম দীনুল হক অর্থাৎ সত্যভিত্তিক জীবনব্যবস্থা; দীনুল ফেতরাহ বা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিশীল জীবনব্যবস্থা; দীনুল ওয়াসাতা অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা; এই ভারসাম্য দেহ ও আত্মার, দুনিয়া ও আখেরাতের। না চরমপন্থা, না নরমপন্থা। দীনুল কাইয়েমাহ বা আবহমান ও চিরন্তন জীবনব্যবস্থা। যা ছিল-আছে-থাকবে, অর্থাৎ শাশ্বত, সনাতন। এই দীনের মূলনীতিগুলো দীনের নামের মধ্যেই প্রকাশিত হচ্ছে। এই দীনের একমাত্র কাম্য হলো মানুষের সার্বিক শান্তি। তাই এর নাম আল্লাহ দিয়েছেন ইসলাম, আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। ইসলামের প্রতিটি বিধানই তাই শান্তির লক্ষ্যে প্রণীত, এর প্রতিটি বিধানই মানবপ্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এক সূত্রে গাঁথা, প্রতিটি বিধানই ভারসাম্যযুক্ত এবং চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামী সংস্কৃতির নামে আরবীয় সংস্কৃতি:
আল্লাহর শেষ রসুল আরবে এসেছেন, তিনি আরবের মানুষ, তাঁর আসহাবগণও আরবের মানুষ। প্রতিটি এলাকার যেমন নিজস্ব একটি সংস্কৃতি থাকে, নিজস্ব পোশাক, ভাষা, আচার-আচরণ, রুচি-অভিরুচি, খাদ্যাভ্যাস থাকে তেমনি তাঁদেরও ছিল। আমাদের দেশের একজন নেতা বাংলাতে কথা বলবেন, বাংলাদেশের পোশাক পরবেন এটাই স্বাভাবিক। তেমনি রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবীগণ আরবীয় পোশাক পরেছেন, আরবিতে কথা বলেছেন, আরবীয় খানা-খাদ্য খেয়েছেন। এর দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না, যে সারা দুনিয়ার মানুষকেই ঐভাবে আরবিতে কথা বলতে হবে, আরবীয় জোব্বা, পাগড়ি পরিধান করতে হবে, খোরমা-খেজুর খেতে হবে। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি আরবীয় রীতি নীতি অনুসরণ করে তবে সে তা করতে পারে, কেননা যে কোনো অঞ্চলের সংস্কৃতি গ্রহণ করার স্বাধীনতা সকলের

আছে।

কিন্তু আমাদের সমাজে ইসলামী সংস্কৃতি বলতেই আরবীয় সংস্কৃতিকে নির্দেশ করা হয় এবং অন্য সকল অঞ্চলের শিল্প-সংস্কৃতি, পোশাক-আশাক, আচরণকে অনৈসলামিক বলে গণ্য করা হয়। যেমন ইসলামের অধিকাংশ আলেমদের সিদ্ধান্তমতে পুরুষের ছতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকতে হবে। এখন কেউ যদি ধুতি পরিধান করে তাহলেও কিন্তু তার ছতর আবৃত হয়। কিন্তু ধুতি পরাকে কি আলেমরা ইসলামী সংস্কৃতি বলে মেনে নেবেন? না, তারা একে হিন্দুয়ানী পোশাক বলে ঘৃণার চোখে দেখবেন। তারা চান মানুষকে তেমন জোব্বা পরাতে যেটা আরবের লোকেরা পরে থাকেন। আরবিতে আজেবাজে কিছু লেখা থাকলেও আমরা চুমু খেয়ে বক্ষে আগলে রাখি। সুতরাং বোঝা গেল আরবীয় সংস্কৃতিকেই আমাদের সমাজে ইসলাম বলে গণ্য করা হচ্ছে।

এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। প্রতিটি অঞ্চলের সংস্কৃতির বিনির্মাণে ধর্মের পর সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে সে এলাকার অর্থনীতি। এ দিক থেকে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কৃষি সংস্কৃতিই বোঝায়। পলিগঠিত জমির কৃষিনির্ভর বাংলার কৃষক ধর্মে হিন্দু হোক আর মুসলিমই হোক, বৌদ্ধ হোক বা খ্রিষ্টানই হোক, তার জীবনের আনন্দ, বেদনা, উৎসব, আশা-নিরাশার সঙ্গে ফসলের নিবিড় বন্ধন থাকবে এ কথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। নতুন ধান ঘরে তোলার আনন্দ তাই এ অঞ্চলের মানুষের প্রাণের সঙ্গে যুক্ত। বাংলা ফসলি বছরের সঙ্গে এদের ভাত-কাপড়ের সম্পর্ক। তাই চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি কৃষিনির্ভর বাঙালির জীবনমানের মানদণ্ড। এই বাস্তবতা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

(খ) শরিয়তের মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে:

এখন দেখা যাক, এই উৎসব উদ্‌যাপন কি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ? প্রথম কথা হচ্ছে- আল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে কয়েকটি জিনিসকে হারাম করেছেন, সেগুলো হারাম। কিছু খাদ্য আছে হারাম যেমন- শুকর, মদ, মৃত পশু ইত্যাদি। কিছু উপার্জন আছে হারাম যেমন- সুদ, জুয়া খেলা ইত্যাদি। কিছু কাজ আছে হারাম যেমন অশ্লীলতা, রিয়া, অপচয়, অসার কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। কিছু কথা আছে হারাম যেমন মিথ্যাচার, গীবত ইত্যাদি। বিয়ে করার জন্য কিছু নারী আছে হারাম যেমন মা, বোন, ফুপু, খালা ইত্যাদি। এসবের বাইরে যা কিছু আছে তা বৈধ বা হালাল। কোনো বিষয় (যেমন একটি উৎসব) হালাল না হারাম তা নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য ও ফলাফলের উপর। কোনো কাজের উদ্দেশ্য বা পরিণতি যদি মানুষের অনিষ্টের কারণ হয় তাহলে সেটা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় মানুষের কল্যাণ বা ইষ্টসাধন তাহলে একে হারাম ফতোয়া দেওয়ার কোনো কারণ

নতুন ফসল ওঠার আনন্দ-উৎসব কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত। আল্লাহ ইয়াউমুল হাসাদ অর্থাৎ ফসল কাটার দিনে গরিবদেরকে ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান বাধ্যতামূলক করেছেন। এই উৎসবের দিনে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন যেন অপচয় করা না হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি উল্টো দৃশ্য। যেকোনো উৎসবের দিনে ধনীরা অপচয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন আর ব্যবসায়ীরা দিবসটিকেই পণ্যে পরিণত করেন। এসব আনন্দ উৎসবে বিশ্বের অভুক্ত, অর্ধভুক্ত কোটি কোটি মানুষের কোনো অংশ থাকে না। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উন্নত দেশে উৎসবের নামে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও বরকত ফল-ফলাদির কী নিদারুণভাবে অপচয় করা হচ্ছে। এই কথাটিই আল্লাহ বলেছেন যে, দিবস পালন করো কিন্তু অপচয় করো না। এইসব অনাচার দেখে ধর্মবেত্তারা ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে এই জাতীয় উৎসব পালনকেই হারাম বলে ফতোয়া জারি করেন।

থাকতে পারে না।

আমরা পবিত্র কোর'আনের সুরা আন'আমের ১৪১ নম্বর আয়াতটি থেকে কৃষি-সংস্কৃতির দিবস উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে আল্লাহর নীতিমালা জানতে পারি। এ আয়াতে আল্লাহ বলছেন,

তিনিই শস্যক্ষেত্র ও সবজি বাগান সৃষ্টি করেছেন, এবং সে সমস্ত (লতা জাতীয়) গাছ যা মাচার উপর তুলে দেয়া হয়, এবং যা মাচার উপর তোলা হয় না এবং খেজুর গাছ ও বিভিন্ন আকৃতি ও স্বাদের খাদ্যশস্য। এবং জলপাই জাতীয় ফল ও ডালিম সৃষ্টি করেছেন- যা একে অন্যের সাদৃশ্যশীল এবং সাদৃশ্যহীন। এগুলোর ফল খাও, যখন তা খাওয়ার উপযোগী হয় এবং **ফসল তোলার দিনে (ইয়াউমুল হাসাদ)** এগুলোর হক আদায় করো। কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়ীদেরকে পছন্দ করেন না।

এ আয়াতে তিনটি শব্দ লক্ষণীয়, (ক) ফসল তোলার দিন, (খ) হক আদায় করা, (গ) অপচয় না করা। কোর'আনের প্রসিদ্ধ ইংরেজি অনুবাদগুলোতে (যেমন আল্লামা ইউসুফ আলী, মারমাডিউক পিকথল) ফসল তোলার দিনের অনুবাদ করা হয়েছে Harvest day. আয়াতটিতে আমরা কয়েকটি বিষয় পাচ্ছি:

১. কৃষক যা কিছু চাষ করে তা ফল বা ফসল যাই হোক, সেটা কাটার দিন (ইয়াওমুল হাসাদ) এর হক আদায় করতে হবে। সেই হক হচ্ছে- এর এক একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসাব করে গরিব মানুষকে বিলিয়ে দিতে হবে। ফসলের এই বাধ্যতামূলক যাকাতকে বলা হয় ওশর।

২. যেদিন নতুন ফসল কৃষকের ঘরে উঠবে সেদিন স্বভাবতই কৃষকের সীমাহীন আনন্দ হবে। এই আনন্দের ভাগিদার হবে গরিবরাও। কেননা তারা ফসলের অধিকার পেয়ে সন্তুষ্ট হবে, তাদের দারিদ্র্য ঘুঁচে যাবে। কিন্তু আল্লাহ সাবধান করে দিলেন এই আনন্দের আতিশয্যে যেন কেউ অপচয় না করে।

আমাদের দেশে ফসল কাটার দিনে আনন্দ করা হয়, বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন পার্বণ পালন করা হয়। উপর্যুক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে দেখা গেল এই দিবসগুলোতে উল্লিখিত কাজগুলো করা ফরদ। যারা একে অস্বীকার করবে তারা আল্লাহর বিধানকেই অস্বীকার করল। কেবল ইসলামের শেষ সংস্করণ নয়, মুসা (আ.) এর উপর যে শরিয়ত নাজেল হয়েছিল সেটিতেও ছিল উৎসব পালনের নির্দেশ। আল্লাহ বলেন,

"Celebrate the Festival of Harvest, when you bring me the first crops of your harvest."Finally, celebrate the Festival of the Final Harvest at the end of the harvest season, when you have harvested all the crops from your fields. (Exodus 23:16)

তুমি ফসল কাটার উৎসব অর্থাৎ ক্ষেতে যা কিছু বুনেছ তার প্রথম ফসলের উৎসব পালন করবে। বছর শেষে ক্ষেত থেকে ফসল সংগ্রহ করার সময় ফলসঞ্চয় উৎসব পালন করবে। (তওরাতঃ এক্সোডাস ২৩ঃ ১৬) সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ইসলামের পূর্বের সংস্করণগুলোতেও নবান্ন বা ফসল কাটার উৎসব পালন করার হুকুম ছিল এবং সে মোতাবেকই বিভিন্ন জনপদে এই উৎসবগুলো প্রচলিত হয়েছে।

বর্তমানে যেভাবে দিবসগুলো পালিত হচ্ছে:

পহেলা বৈশাখও ফসলি বছরের প্রথম দিন হিসাবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখন কথা হচ্ছে, বর্তমানে আমাদের দেশে যেভাবে (Process) পহেলা বৈশাখ পালন করা হয় সেটা কী উদ্দেশ্যে করা হয়? তাতে কি আল্লাহর দেওয়া দরিদ্রের অধিকার ও আনন্দ উদ্‌যাপনের মানদণ্ড রক্ষিত হয়?

না। বর্তমানে পহেলা বৈশাখের নামে প্রকৃতপক্ষে যা করা হয় তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই বাণিজ্যিক। আমরা জানি যে, হলি ক্রিসমাস, ঈদ, পূজা ইত্যাদি প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় উৎসব হলেও বাস্তবে এগুলো কিছু স্বার্থান্বেষী শ্রেণির বাণিজ্যের উৎস ছাড়া কিছুই নয়। যেমন ঈদ আসার একমাস আগে থেকেই শুরু হয় কেনাকাটা, উৎসবের নামে ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি অপচয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। ধর্মব্যবসায়ী কথিত আলেম শ্রেণি সারা রমজান মাস তারাবি পড়িয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, দানবাক্সের আবাদ করে, বহু উপায়ে 'অর্থকরী ফসল' ধর্ম বিক্রি করে জোব্বার পকেট ভারি করেন। ঈদের বকশিশ তো আছেই। টিভি চ্যানেলগুলো ঈদকে সামনে রেখে সাতদিনের অনুষ্ঠানমালা সাজায় যার স্পন্সর আদায় করে তারা কোটি কোটি টাকা কামিয়ে নেয়। মুদি দোকান থেকে শুরু করে কোমল পানীয়, ফ্রীজ, টেলিভিশন, মোবাইল কোম্পানিগুলোর ব্যবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। বাজারের প্রতিটি পণ্য ও সেবার সঙ্গে যুক্ত হয় ঈদ অফার। অর্থাৎ ঈদের উদ্দেশ্য ধর্মপালন নয়, মানুষের কল্যাণসাধনও নয়, গরীবের মুখে হাসি ফোটানোও নয়, নিরেট উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল। একইভাবে পহেলা বৈশাখের উদ্দেশ্যও বাণিজ্যিক। একটি ৫০০ টাকার ইলিশের দাম হয়ে যায় ৫০০০ টাকা। যারা সারা বছর বার্গার, পিজা আর হটডগ খায় তারা এই একটা

দিন বাঙালি পোশাক পরে, মাটির বাসনে শুকনো মরিচ দিয়ে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার জন্য হা-পিত্তেশ করেন। প্রতিটি লোকজ জিনিসের দাম হয়ে যায় আকাশচুম্বি। একদিনের এই বাঙালিয়ানা যেন তাদের একদিনের মাতৃভক্তি, দিন শেষ ভক্তি শেষ। এটা যে বাঙালি সংস্কৃতির প্রতি তাদের অবজ্ঞা ও অবমাননারই বহিঃপ্রকাশ তা চিন্তা করার অবকাশও দিচ্ছে না বৈশাখ ব্যবসায়ীরা। আর আমাদের তারুণ্যও উন্মাদনায় মত্ত হয়ে নব্য ফিউডালিজমের তেলের যোগান দিয়ে যাচ্ছে, অনেক অশ্লীলতারও বিস্তার ঘটছে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। যখন কোনো সাংস্কৃতিক উৎসব পালনের নামে অন্যায় ও অশ্লীল অপসংস্কৃতির চর্চার পথ প্রশস্ত করা হয়, কোনো বিষয়ে সীমালংঘন এবং অত্যাধিক বাড়াবাড়ি দেখা দেয়, তখন প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এর বিরুদ্ধে আলেমদের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়াটা খুবই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। পাশাপাশি নিজেদের আরবীয় সংস্কৃতির বাইরে কোনো কিছুকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে না পারার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এই উৎসব পালনকেই হারাম ও বে'দাত বলে ফতোয়া দিতে ধর্মবেত্তাদের অনুপ্রাণিত করছে।

মানুষ কেবল দেহ নয়, তার আত্মা আছে। দেহের যেমন খাদ্য প্রয়োজন তেমনি আত্মার প্রয়োজন নির্মল আনন্দ। এই আনন্দের জন্য মানুষ আল্লাহর উপাসনাও করতে পারে, আনন্দ উৎসবও করতে পারে। অর্থাৎ অন্যের অধিকার (হক) নষ্ট না করে যার যেটা ইচ্ছা সেটা করতে পারে। আমরা অস্ট্রেলিয়ার শিনচিলা শহরে প্রতিবছর উদযাপিত তরমুজ উৎসব বা ওয়াটামেলন ফেস্টিভ্যালের কথা জানি। সেদিন হাজার হাজার তরমুজের রস দিয়ে একটি পিচ্ছিল পথ তৈরি করে তাতে স্কী করা হয়। একইভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ফসল যেমন আঙ্গুর, টমাটো ইত্যাদি নিয়েও হারভেস্ট ফেস্টিভ্যালে অপচয়ের মহোৎসব করা হয়। আল্লাহ খাদ্য ও সম্পদের এই দানবিক অপচয়কে নিষিদ্ধ বা হারাম করেছেন, কিন্তু আনন্দ করতে বাধা দেন নি। আল্লাহ বলেছেন, "খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না; কারণ আল্লাহ তাআলা অপচয়কারীদেরকে ভালোবাসেন না। হে রসুল! আপনি বলে দিন, কে হারাম করেছে সাজসজ্জা গ্রহণ করাকে--যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন?" (সুরা আরাফ ৩১-৩২)। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ আছে যারা দুর্ভিক্ষপীড়িত। সেই সব ক্ষুধার্ত মানুষের হক আছে এই ফল ও ফসলে। এই নবান্নে, পয়লা বৈশাখের উৎসবে, চৈত্রসংক্রান্তির পার্বণে, তাদের সেই হক আদায় করা হলেই এই উৎসব হবে পবিত্র দিন। উৎসব আর ঈদের মাঝে অর্থগত কোনো পার্থক্য নেই, দুটো আসলে একই শব্দ। শুধু নববর্ষের নামে আজ যে নিদারুণ অপচয় হচ্ছে, বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল করা হচ্ছে অর্থাৎ এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা হয়েছে, তা না করে যদি সেই অর্থ গরিব-দুখী মানুষকে প্রদান করা হতো অর্থাৎ শস্য, ফলমূল ইত্যাদি সকলে মিলে ভাগাভাগি করে খেত, তাহলে নবান্ন আর পহেলা বৈশাখ পালন এবাদতে পরিণত হতো।

বরগুনা পাথরঘাটা এলাকার নদী থেকে ধরা এই ইলিশটি ১২ হাজার টাকা দিয়ে কিনেছেন পাইকারি মাছ বাজারের আড়তদার কামরুল হুদা মিরাজ। নিজে খাওয়ার জন্য নয়, ইলিশ উন্মাদনার এই সুযোগে তিনি এটি আরো অধিক মূল্যে বিক্রির আশা রাখেন। পহেলা বৈশাখের উৎসবকে সামনে রেখে এই যে ব্যবসায়িক স্বার্থ হাসিল আর অপচয়ের প্রদর্শনী, আল্লাহ এটা অপছন্দ করেন। তিনি চান, উৎসবের দিনগুলোতে মানুষ দুঃখী, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়াবে, তাদের দুঃখ নিবারণের জন্য চেষ্টা করবে। এর মাধ্যমেই দিবসটি সার্থকতা লাভ করবে।

সমুদ্রের ঢেউ, নদীর স্রোতধারা, ঝর্ণার প্রবাহ, মেঘের বৃষ্টি, রৌদ্রের প্রখরতা, সূর্যের উদয়াচল থেকে অস্তাচল- প্রত্যেকেই তার নিজস্ব জগতে মহা উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে গতিশীল (Dynamic)। গতিশীল মানবজাতিও। প্রগতিই মানুষের বৈশিষ্ট্য। ধর্ম সেই প্রগতিকেই আরও গতিশীল করে। ধর্ম কোনো স্থবিরতার নাম নয়, নয় কোনো মৃত চিন্তার নাম। ধর্ম তো জীবন, আর জীবন সর্বদাই গতিশীল।

প্রকৃতি প্রগতিশীল তবে ধর্মে কেন স্থবিরতা?

ইলিয়াস আহমেদ

কালের ইতিহাসে সবকিছুই লেখা হয় না আবার কিছু কিছু জিনিস ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনও পড়ে না। আসলে এসব ইতিহাসও নয়, বলতে গেলে একেকটা বহমান ঘটনার বৃত্তান্ত। তেমনি একটি বৃত্তান্ত হলো- নগরসভ্যতার স্পর্শ পেয়েও কোনো এক সমাজের স্বাভাবিক যুবকটি হঠাৎ করেই গেরুয়া বসনে উধাও হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন পর তার মুখ ভর্তি দাঁড়ি-গোঁফ আর মাথাভর্তি চুলের নিথর দেহটি পাওয়া গেলো সমাজ-নগর-দেশ থেকে বহুদূরের কোনো এক গুহায় অথবা পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট এক ঝোঁপঝাড়ে। সেই গেরুয়া বসনের যুবকটির কাছ থেকে পৃথিবী কিছুই পায় নি, সমাজ-দেশ-পরিবার তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে নি। অথবা এটাও তো আমরা শুনে থাকব, কোনো এক মুদি দোকানদার বাবার সঙ্গে সেই কিশোরকাল থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার জীবন কাটিয়ে দিয়েছে সেই মুদি দোকান আর সংসারের দেখভাল করে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তার প্রাত্যহিক রুটিন ছিলো একই। দোকান অভিমুখী একই রাস্তায় যাতায়াত। তার দ্বারা পরিবার ব্যতীত মানবসমাজ তেমন উপকৃত হতে পারে নি। আচ্ছা, আমাদের কি মনে আছে ঐ যুবকটির কথা, যে কলেজ পাস করার পর সওদাগরী অফিসে একটা চাকরি পেয়েছিল? তারপর বিয়ে-সংসার। সেই সকাল থেকে বিকেল অবধি একটানা অফিস করার পর ক্লান্ত পায়ে সে বাজার করে বাড়ি ফিরত আর গিন্নী বাজারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকত? আমাদের কি মনে আছে তাদের কথা? সারাজীবন অফিস আর সংসার করে করে বার্ধক্যে বেচারা বিষাদময় হতাশায় ভুগছিল- সারাজীবন সে কী করেছে? না পেরেছে জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে, না তার দ্বারা মানবসমাজ তেমন কিছু উপকৃত হয়েছে। নিজেকে মূল্যহীন ভাবতে ভাবতে একসময় তার চিন্তাভাবনা থেমে যায় চিরতরে।

আবহমান জীবনযাপন আর ইতিহাস থেকে বের হয়ে যুগের হাওয়ায় এবার চলুন একটু ভাসি প্রগতির প্যারাস্যুটে। যোগাযোগ ব্যবস্থায় চরম উন্নতির ফলে আমরা আজ অনায়াসেই কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংস্কৃতির সাথে মিশে যেতে পারি, অন্যের সংস্কৃতি লালন করতে পারি। সদ্য উদ্ভব হওয়া কোনো সংস্কৃতিকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারি। যেখানে সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটতে আগে সময় লাগত শত শত

বছর সেখানে এখন বছরে বছরে আমাদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, মানদণ্ড ও সামাজিক অনুসর্গ-উপসর্গের পরিবর্তন হচ্ছে। শুধু সংস্কৃতিতে নয়, এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির কারণেই মেসোপটেমিয়া, মিশর, গ্রিক, রোম, পারস্য নামের আজ অঞ্চলভিত্তিক কোনো সভ্যতা নেই। সব সভ্যতা মিলে আজ গ্লোবাল ভিলেজে একাকার হয়ে গেছে। যান্ত্রিক প্রগতির সাথে সাথে পাল্টে গেছে আমাদের চিন্তাভাবনা, ধ্যান-ধারণা। গভীর রাতের পুকুরে ভাসমান আলেয়া আজ অবমুক্ত মিথেন, ঝাঁড়-ফুঁকে আজকাল তেমন একটা বিশ্বাস নেই মানুষের, যতোটা বিশ্বাস আছে একজন ডাক্তারের প্রতি। তাই বলে কুসংস্কারের বিশ্বাসী, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদ, মানসিক জরাবাতিকগ্রস্থ শ্রেণিটি যে নেই তা কিন্তু না। বরং তাদের সংখ্যাই প্রগতি ও আধুনিক চিন্তাধারার জনসংখ্যার চেয়ে ঢের বেশি। এই যে বৃহৎ এক জনশক্তি যাদের একটু সচেতনতায় পৃথিবীতে নেমে আসত শান্তি, যারা ইচ্ছে করলেই পারত পৃথিবীটাকে সুন্দর করে সাজাতে, যারা ইচ্ছে করলেই পারত স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন করতে তারা যেমন মৃত, বিকৃত, কুসংস্কারময় ধর্মকে আঁকড়ে ধরে বুঁদ হয়ে আছে অন্যদিকে যারা অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ পোশাক পরিধান করে, বিবিধ মাদকতা আর উন্মাদনায় ডুবে থাকে, নারী অধিকারের নামে তাকে শোবিজের হাঁটে নগ্ন-পোশাকে উপস্থাপন করে, তার দেহকে বিজ্ঞাপনের সামগ্রী বানায়, উদারতার নামে সমকামিতার কীর্তন করে, অর্থাৎ কথিত প্রগতিবাদীরা, তারাও ভিন্ন ধাঁচের জরা-বাতিকগ্রস্থতায় আক্রান্ত। একজন কুসংস্কারে বিশ্বাসী আরেকজন অতি সংস্কারে বিশ্বাসী, একজন ধর্মান্ধতায় বুঁদ অন্যজন ধর্মহীনতায় বুঁদ, একজন আপাদমস্তক আবৃত করার পক্ষে অন্যজন যতদূর সম্ভব নগ্নতার পক্ষে। শান্তিলাভকে যদি উন্নতির মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে কোনটি শান্তিদায়ী? আমি বলব, দুটি শ্রেণির মধ্যে ফলাফলগতভাবে তেমন একটা পার্থক্য নেই। অর্থাৎ দুটো শ্রেণিই ভারসাম্যহীন, পরস্পরের প্রতি চরম বিদ্বেষে ভারাক্রান্ত অন্তর নিয়ে যাদের প্রতিটি দিন কাটে। কথা বলার সুযোগ পেলেই তারা একে অপরের চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে। তাই আসুন, যারা শান্তি চাই, তারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে উভয়ের থেকে সমদূরত্বে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রশ্ন করি- এই উভয়ের মধ্যে কোনটাকে আমরা গ্রহণ করব- অন্ধত্ব না প্রগতি?

এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়, ধর্মান্ধতা-কূপমণ্ডূকতা-গোঁড়ামি-সাম্প্রদায়িকতা-কুসংস্কারমনার নামে স্থবিরতা মানবসমাজের গতিময়তাকে রুদ্ধ করে, পথিককে নতুন পথ সৃষ্টি করার প্রেরণা যোগায় না বরং প্রাচীন কানাগলিতে চলার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে, তথা শান্তি প্রতিষ্ঠায় এ সকল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয় কখনই কাম্য নয়। কারণ প্রকৃতি যেখানে নিয়ত গতিময়, পরিবর্তনশীল সেখানে আমরা মানুষ কোন যুক্তিতে অনড়, অচল একটি অবস্থানকে নিয়তির মতো ধরে রেখে স্থবিরতার পরিচয় দেব?

প্রাণিভূগোলে 'মহাদেশীয় সঞ্চারণ' (Continental drift) নামে একটা তত্ত্ব আছে, যেখানে সময়ের প্রেক্ষিতে সাতটা মহাদেশের পরস্পর থেকে ক্রমমান দূরে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা আলোকপাত করা হয়েছে। এই 'মহাদেশীয় সঞ্চারণ' দুয়েক দিনে হঠাৎ করেই সম্ভব হয় নি বা সে অনুযায়ী ঘটছেওনা; সময়ের প্রেক্ষিতে খুব ধীরে সেটা ঘটেছে এবং এখনও ঘটছে। অর্থাৎ পৃথিবী শুধু আহ্নিক আর বার্ষিক গতিতেই গতিশীল এমনটি নয়, আন্তঃঅভ্যন্তরীণেও চলছে গতিময় পরিবর্তন। পৃথিবীতে অবস্থিত যত সৃষ্টি আছে সব কিছুই গতিশীল। অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে সবকিছু। ইলেকট্রনের প্রদক্ষিণ, আয়নের ছোটাছুটি, কোষের বিভাজন কেনোটাই স্থবিরতার পরিচয় দেয় না। জড় থেকে জীব সবাই তার নিজস্বগতিতে গতিশীল। কেউ থেমে নেই। আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদকে স্থির মনে হলেও তার অভ্যন্তরীণে মূল থেকে পাতায় পাতায় চলছে শ্বসন, প্রস্বেদন তথা আয়নের ছোটাছুটি, কোষের বিভাজন। অবাত শ্বসন-সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পন্নে সে সর্বদাই গতিশীল। এককোষী প্রাণী অ্যামিবা পর্যন্ত স্থির নয়, ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে সে ছুটে চলে জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখতে। সৃষ্টির সেরা মানুষের অভ্যন্তরেও প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে জৈবিক গতিময় ব্যবস্থা, যা স্বয়ংক্রিয় (Automatic)। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ, ধমনী-শিরার মাধ্যমে ক্রমাগত রক্তসঞ্চালন, কোষের বিভাজন ও দেহের বৃদ্ধি সবকিছুই প্রকৃতির সদাগতিয়মতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শুধু পৃথিবী ও তার সৃষ্টিতেই এই গতিময় অবস্থা বিরাজমান তা নয়, ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনেও বলা হয়েছে, সৃষ্টির শুরু থেকেই মহাবিশ্ব ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। আল্লাহ বলেন, "আমি স্বীয় ক্ষমতাবলে আকাশ নির্মাণ করেছি এবং আমিই এর সম্প্রসারণকারী" (সুরা যারিয়াত ৪৭)। যদিও কয়েক দশক আগে এই তত্ত্বের ধ্যান-ধারণা ও প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী হাবল-এর (Hubble) মতো বিজ্ঞানীরা। যে কোনো অবস্থান থেকে দেখলে মনে হবে বাকি সবকিছু পিছিয়ে যাচ্ছে। এই সম্প্রসারণ দূরবর্তী 3C-295 গ্যালাক্সির জন্য প্রতি সেকেন্ডে ৯০,০০০ মাইল। যাইহোক, মূলকথা হলো পৃথিবীসহ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সবই সাম্যাবস্থায় পরিণত হওয়ার অভিপ্রায়েই হোক আর অন্য কোনো অবস্থায় পরিণত হওয়ার লক্ষ্যেই হোক, ক্রমবর্ধমান গতিশীল। অর্থাৎ এতেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রাকৃতিকভাবেই পৃথিবীসহ মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সবকিছুতেই গতিময় (Dynamic) একটা অবস্থা বিদ্যমান। পার্থক্য শুধু কার্যে-ক্ষেত্রে-ধরণে। কিন্তু সবার লক্ষ্যই যেন এক, অভিন্ন- এক মহা

উদ্দেশ্য সাধনে সবাই মহা ব্যতিব্যস্ত- কেউ থেমে নেই।

এ থেকে বুঝা যায়, সৃষ্টিগত ভাবেই আমরা মানুষ গতিশীল। আমাদের অস্তিত্বজুড়ে স্পন্দন। গতিহীনতাই মৃত্যু। তাই জরা-বাতিকগ্রস্থতা, পিছুটান, স্থিতিশীল থাকা আমাদের সাজে না। সে অনুযায়ী স্থবিরতা আমাদের কখনোই কাম্য নয়, প্রগতিই আমাদের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত এবং অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু আমরা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছি বর্তমান সভ্যতায় প্রগতি বলতে যা বুঝায় তা সর্বদাই শান্তিময় ও কল্যাণকর নয়। প্রগতির নামে আজ যা চলছে তা সবই শুধু স্থবিরতার নয় পশ্চাদগামিতার পরিচয় দেয়। যেমন প্রগতিবাদীদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় উপভোগের স্বাধীনতা, এর মধ্যেই চলে আসে নগ্নতা, অশ্লীলতা, নারীদেহের বাণিজ্যিক ব্যবহার ও প্রদর্শনী, সমকামিতা ইত্যদির অধিকার। এগুলো কোনটা প্রগতির পরিচয় বা নব আবিষ্কার? এর সবগুলোই সুদূর অতীতের বর্বর অসভ্যতার যুগগুলোতে মানুষ মাড়িয়ে এসেছে। প্রগতির পক্ষে যারা তাদের এটাতো মাথায় রাখতে হবে, প্রগতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ। যে প্রগতি দিয়ে মানবতার কল্যাণ হয় না বরং যার ফলে বিদ্বেষ বাড়ে, পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত বাড়ে অপরাধ, ভারসাম্যহীনতা; যে প্রগতি মানুষকে শান্তি দিতে পারে না সেটা কখনই প্রকৃত অর্থ প্রগতি হতে পারে না- সেটা প্রগতির নামে প্রতারণা, পশ্চাদগামিতা। আজ অধিকাংশ মানুষই মনে করছেন, যে যত বেশি আধুনিক যান্ত্রিক প্রগতি ও সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে সে ততোই সপ্রতিভ, প্রগতিমনা, আধুনিকমনা। তাই যে ফেসবুক বোঝে না, তাকে ব্যাকডেটেড মনে করা হয় আর যে নায়ক-নায়িকাদের অনুকরণে পোশাক-আশাক পরে অষ্টবক্রকলেবর হয়ে নাকমুখ বাঁকা করে স্মার্টফোনে সেলফি তুলে থ্রিজি কানেকশান ব্যবহার করে আপলোড করতে পারে তাকেই আপটুডেট মনে করা হয়। দিনরাত সামাজিক যোগাযোগ সাইটে বুঁদ হয়ে থাকা, বার-পার্টি-কনসার্টে, থার্টিফার্স্ট, ভালোবাসাদিবস, বন্ধুদিবস ইত্যাদিতে মাদকসেবনের পাশাপাশি রাতবেরাত বন্ধু-বান্ধবীর সাথে আড্ডা দেয়া, ডেটিং করা (বিস্তারিত না বললেও চলবে), ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে টিভির সামনে বসে খেলা-সিনেমা-সিরিয়াল দেখা, ঘরে কিংবা সাইবার ক্যাফেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কম্পিউটারে গেম খেলা, সানগ্লাস আর থ্রি-কোয়ার্টার প্যান্ট পরে অস্বাভাবিক গতিতে বাইক চালিয়ে নায়কত্ব দেখানো, মুখে বাংরেজি বুলি ও খিস্তি-খেউড়, ইভটিজিং করা প্রভৃতি আধুনিকতা ও প্রগতিমনার অন্যতম শর্ত। আরেকটু আধুনিক হতে হলে এগুলোর পাশাপাশি ধর্মকে গালিগালাজ করতে হবে। যে যত বেশি এগুলোর সাথে আপডেট সে তত আধুনিক, তত স্মার্ট, তত প্রগতিশীল। কিন্তু আসলেই কি তাই? না। এগুলো আধুনিক যুগের অন্ধত্ব।

প্রতিটি জিনিসের ভালো মন্দ নির্ভর করে তার ব্যবহারের উপর। একটা মোবাইল বা কম্পিউটারের আবিষ্কারে কোনো দোষ নেই, বরং আশীর্বাদ। যান্ত্রিক প্রযুক্তিকে যতক্ষণ মানবকল্যাণে ব্যবহার করা হবে ততক্ষণ সেটা প্রগতির পরিচয় দেবে কিন্তু যখনই সারা দিনরাত কেউ অপ্রয়োজনে টিভি-কম্পিউটার-ইন্টারনেট-সামাজিক যোগাযোগ সাইটে বুঁদ হয়ে থেকে তার জীবন থেকে মূল্যবান সময়-শ্রম নষ্ট করে, অনুৎপাদনশীল, স্থবির, গতিহীন হয়ে বসে থাকবে তখন সেটা সার্বিক দিক দিয়ে কখনই প্রগতিশীলতার পরিচয় দেয় না। বরং সেই যান্ত্রিক প্রগতি তখন সার্বিক অধোগতির পরিচয় বহন করে। নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার, উঁচু থেকে উঁচুতর বিল্ডিং নির্মাণ, বাঁশের সাকো, কাঠের পুল থেকে নয়নাভিরাম কয়েক লেনযুক্ত ব্রিজ নির্মাণ- এসব প্রগতির পরিচয় বহন করে ঠিক, কিন্তু যখন একজন মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে সেই প্রাণহীন নিথর লাশকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়, ধর্ষণ, যুদ্ধ, রক্তপাত, অভাব-অনটন সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে সমাজকে বিষময় করে তোলে তখন এ কথা বলাই যায় যে, সার্বিকভাবে ওই সমাজ প্রগতির পথে নয়, অধোগতির পথে যাচ্ছে। যান্ত্রিক প্রগতির সাথে সার্বিক প্রগতিকে গুলিয়ে ফেলাটাই হবে সবচেয়ে বড় ভুল। আজ থেকে একশ' বছর আগের সাথে বর্তমান সমাজের অপরাধসংক্রান্ত পরিসংখ্যানের একটি তুলনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দিন দিন আমরা কেবল পশ্চাদপসারণই করছি। যান্ত্রিক প্রগতিকে যদি আমরা সার্বিক প্রগতির লক্ষ্যে ব্যবহার করতে চাই, তবে এমন কিছু সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ আমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যা আমাদের মন ও দেহের সাথে ভারসাম্যপূর্ণ। এটা ভুললে চলবে না যে, আমরা যন্ত্র নই, আমরা আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে মানুষ। যদি আত্মা না থাকত তবে আমরা পুরোপুরি যান্ত্রিক প্রগতির উপর নির্ভরশীল হয়ে সুখে শান্তিতে দিন কাটাতে পারতাম। কিন্তু আমাদের আত্মা সবসময় কর্মপালনে ব্যস্ত থাকতে চায় না, আত্মা নির্দিষ্ট সময়ে নীরবতা চায়, চিন্তা ও কল্পনা করতে চায়। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতায় ডুবে থেকে ক্লান্তি-শ্রান্তির পর অবশেষে পাশ্চাত্য দেশগুলোর মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, আমরা আসলেই শুধু দেহনির্ভর নয়, আমাদের আত্মা বলেও কিছু একটা আছে। সেই আত্মিক প্রশান্তির জন্য তারা বেছে নিয়েছে বিভিন্নরকম মেডিটেশন পদ্ধতি ও ধর্মান্তরিত হওয়ার সংস্কৃতি।

অতএব সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ালো যে, মানবকল্যাণের লক্ষ্যে যে যান্ত্রিক প্রগতি সেটাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে হবে। আর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত হলো, আমাদের দেহ ও মনের সাথে যা ভারসাম্যপূর্ণ তথা স্রষ্টার দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে,

যান্ত্রিক প্রগতির স্রষ্টা ও মালিক মানুষ নিজেই। কারণ, স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির মাঝে কেবল মানুষকেই জ্ঞান নামের অমূল্য এক সম্পদ দান করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি আদমকে শিক্ষা দিলে সমস্ত বস্তুর নাম (সুরা বাকারা ৩১)। সেই জ্ঞান কী করে ব্যবহার করতে হয় সেটার জন্য তিনি দিয়েছেন বুদ্ধি-বিবেক। আল্লাহ বলেন, "অতঃপর আল্লাহ তাকে জানালেন কোনটি তার জন্য ভুল এবং কোনটি সঠিক" (সুরা শামস ৮)। আর আমরা মানুষতো শুধু আল্লাহর দেওয়া অকল্পনীয় শক্তিশালী মস্তিষ্কটি খাটাচ্ছি আর পরিশ্রম করেছি, স্রষ্টাও তাই চেয়েছেন। ঐশী গ্রন্থ কোর'আনে তিনি বলেছেন, "আমি (আল্লাহ) মানুষকে শ্রমনির্ভরশীল করে সৃষ্টি করেছি" (সুরা বালাদঃ ৪)।

নদীর স্রোতধারা, ঝর্ণার প্রবাহ, সমুদ্রের ঢেউ, মেঘের বৃষ্টি, রৌদ্রের প্রখরতা, সূর্যের উদয়াচল থেকে অস্তাচল প্রত্যেকেই তার নিজস্ব জগতে গতিশীল (Dynamic), কিন্তু মহা উদ্দেশ্য সাধনে সামষ্টিকভাবে প্রত্যেকেই অবদান রেখে চলেছে। প্রত্যেকের এই গতিময় অবস্থাই তাদের স্ব স্ব প্রগতির পরিচয় দেয়। তারা স্থির নয়, তারা থেমে নেই। তাদের মাঝে নেই জরা-বার্ধক্য-কূপমণ্ডূকতা-গোঁড়ামির মতো স্থবিরতা। কারণ বার্ধক্য তো তা-ই, মৃত্যু তো তারই হয় যে অনুৎপাদনশীল (Unproductive), যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভালো কিছুই রেখে যেতে পারে না। যে কেবলমাত্র নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রচেষ্টা করে, আত্মকেন্দ্রিকতায় বুঁদ থাকে সে কখনোই প্রগতিবাদী হতে পারে না, সে স্থবির-জরাবাতিকগ্রস্থতায় যে আক্রান্ত হয়ে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। আর যারা পরার্থে আত্মত্যাগ করে তারাই প্রগতিবাদী, তারাই শহীদ, তাদের কোনো মৃত্যু নেই। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। অমরত্বের আকাঙ্ক্ষাতেই আদম (আ.) ও মা হাওয়া গন্দম খেয়েছিলেন। আমরাও চাই অমর হতে, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে, ইতিহাসের পাতায়, আমাদের কীর্তির মন্দিরে। কিন্তু সেই অমরত্বের পথ সবার ভাগ্যে জোটে না। সেই সুযোগ পৃথিবীতে আবার সৃষ্টি হয়েছে। আসুন, মানবকল্যাণকে সামনে রেখে সকল ধরণের জরা-বার্ধক্য-কূপমণ্ডূকতা-কুসংস্কার-গোঁড়ামি-ধর্মান্ধতা-অন্ধবিশ্বাস-একচোখা দৃষ্টিভঙ্গি ডিঙ্গিয়ে ঝর্ণার মত উদ্দাম ও তটিনির মতো চঞ্চল হই। ধর্মের নামে স্থবিরতা নয়, নয় প্রগতিবাদী ভুতের উল্টোমুখী গতি, আসুন সত্যিকার প্রগতিবাদী হই।

শান্ত-স্নিগ্ধ এদেশ, তাই প্রকৃতি তাদেরকে স্থায়ী হতে দেবে না

রাজনৈতিক সমস্যায় যখন দেশের মানুষের মন থেকে শান্তি তিরোহিত হয়েছে, ঘরে-বাইরে যখন মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট, ব্যবসায়ী, কৃষকসহ সকল শ্রেণির মানুষের মনে যখন উৎকণ্ঠা প্রবলভাবে স্থায়ী রূপ নিয়েছে, পেট্রলবোমা যখন কেড়ে নিচ্ছে জীবন্ত মানুষের প্রাণ, দুঃশাসন কিংবা প্রতিবাদের নামে যখন দেশ কার্যত স্থবির, তখনও কিন্তু প্রকৃতির দিকে তাকালে মনে হয় প্রকৃতিকে তার কিছুই ছুঁতে পারেনি। ঠিকই বসন্ত এসেছে নির্ধারিত সময়ে। আমের গাছে ঠিকই ধরেছে মুকুল। সাদা সাদা সাজনা ফুল ঠিকই ধরেছে গাছে। অপ্রয়োজনীয় ফুলগুলোও ঝরে পড়েছে। ছোট ছোট সাজনাগুলো ঝুলে আছে ডালে। কচি ধান ক্ষেতে ঠিকই দোলা দিয়ে যাচ্ছে মৃদু সমীরণ।

এই দুঃসময়েও গভীর রাতে ঠিকই বৃষ্টি হয়েছে। ঠিক যখন দরকার ছিল তখনই ফসলের জন্য তা বয়ে নিয়ে এসেছে মঙ্গলবার্তা। রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে আশা করার মতো কিছু এখনও দেখা যায়নি। কিন্তু তবুও আশা জাগে একদিন এই দেশ ঘুরে দাঁড়াবে। পুরনো ক্ষতকে পেছনে ফেলে দেশ এগিয়ে যাবে। অন্তত প্রকৃতিকে দেখে তাই মনে হয়। ঘৃণিত এই রাজনীতি একদিন দূর হবেই। এ দেশের মানুষ, এদেশের প্রকৃতির সাথে পেট্রলবোমা আর পোড়া লাশ মানায় না। কালের করাল গ্রাসে কিছু মানুষের হাত ধরে এদেশে প্রবেশ করে এই সহিংসতা। কিন্তু সময়ের আবর্তে তা হারিয়ে যেতে বাধ্য। প্রকৃতি একে দীর্ঘস্থায়ী হতে দেবে না নিশ্চয়। এটা আমাদের বিশ্বাস। আপাতত কোন লক্ষণ দেখা না গেলেও এই বিশ্বাস আমাদের বাঁচিয়ে রাখছে প্রতিনিয়ত, আমাদের বেঁচে থাকার অণুপ্রেরণা যুগিয়ে যাচ্ছে। কামনা করি ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাক এই জঞ্জালগুলো। ওরা এদেশের নয়, এদেশের প্রকৃতিতে তারা বেমানান। এদেশ শান্ত সুশীতল বাতাসের দেশ। এদেশ ধীরলয়ে বয়ে চলা নদীর দেশ। এদেশ জ্যোৎস্নার দেশ। শিয়ালের হুক্কা-হুয়ার দেশ। এখানে পেট্রলবোমার আগুন প্রকৃতি বিরুদ্ধ। এখানে সবুজের সমারোহ, এখানে কোকিলের কুহু কুহু সুরটাই যায়। এখানে রুক্ষতা নয়, এখানে অমানুষেরা কখনোই স্থায়ী আসন গেড়ে নিতে পারবে না। নিশ্চয় এদেশের মানুষ তাদেরকে বিদায় করতে সক্ষম হবে। নিশ্চয় তারা সক্ষম বিদেশে বাড়ি-গাড়ি কেনা, সুইস ব্যাংকে টাকা পাচার করা মানুষগুলোকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে। এই বিশ্বাস আছে বলেই এদেশকে এখনো ভালোবাসি। নিশ্চয় এদেশের মানুষ একদিন গর্জে উঠবে। মসনদ রক্ষা আর মসনদ দখলের লড়াইকে স্তব্ধ করে দেবে। শ্বাসমূলের মতো জাগ্রত হবে নতুন চেতনা। পুরনো একঘেয়ে চেতনা স্থান পাবে আঁস্তাকুড়ে। জয় হোক এদেশের মানুষের, এদেশের প্রকৃতি ধরে রাখুক তার আপন স্বভাব। দোয়েল শিষ দিয়ে যাক এভাবেই এই ভোরের মৃদুমন্দ আবহাওয়ায়। কেউ যেন তাদের থামাতে না পারে। কোনদিনও না।

-আতাহার হোসাইন
লেখক ও কলামিস্ট

পহেলা বৈশাখের মোড়কে রমরমা বাণিজ্য

কাজী আব্দাল্লাহ আল মাহফুজ

বৈশাখী জামা-কাপড় ও ফ্যাশনের কথা বাদ দিলেও কেবল মাত্র পান্তাভাত ও ইলিশের পেছনে যে বিপুল অর্থ অপচয় হয়ে থাকে তা কি এদেশের নিত্য-অনাহারী মানুষের প্রতি এক ধরণের উপহাস নয়?

আজ পহেলা বৈশাখ। ১৪২০ বাংলা সনের প্রথম দিন। এই দিনটিকে বরণ করার জন্য সর্বত্র চলছে নানা আয়োজন। যদিও এসব আয়োজনের অধিকাংশই ঐতিহাসিকভাবে পহেলা বৈশাখের বা বাংলা সনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু একটি বিশেষ শ্রেণী এসব আয়োজনকে 'আবহমান বাংলার ঐতিহ্য', 'বাঙালীর প্রাণের উৎসব' ইত্যাদি বলে চালিয়ে দিচ্ছে এবং আমরাও এই জনপদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় তাদের এসব আয়োজনকে স্বতঃস্ফুর্তভাবেই গ্রহণ করে নিচ্ছি।

ইতিহাস থেকে দেখা যায় মোঘল সম্রাট আকবর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা সনের প্রবর্তন করেন। সম্রাটের আদেশে তৎকালীন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ফতেহউল্লাহ সিরাজি হিজরী সন ও সৌর সনের সমন্বয়ে বংলা সনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন (অবশ্য ইদানীং কিছু কিছু গবেষক এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন)। ভারত উপমহাদেশের আবহাওয়া ও কৃষিকাজের সাথে সমন্বয় রেখেই রেখেই বাংলা সন প্রণয়ন করা হয় যাতে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় সহজ হয়। সে কারণে বাংলা সনকে প্রাথমিক অবস্থায় ফসলী সন হিসাবেও ধরা হতো।

সম্রাট আকবরের শাসন আমলে চৈত্র মাসের শেষ দিনের মধ্যে প্রজাদেরকে খাজনা, মাশুল ইত্যাদি পরিশোধ করতে হতো এবং পরদিন পহেলা বৈশাখে ভূমির মালিকগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্যমে প্রজাদের মিষ্টিমুখ করাতেন। অপরদিকে ব্যবসায়িক ও জনসাধারণের মধ্যে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন শুরু হয় হালখাতার মাধ্যমে। হালখাতা খোলার পর ব্যবসায়িকগণও ভোক্তাদেরকে মিষ্টিমুখ করাতো। আর এইদিন বিকালে গ্রামগঞ্জে আয়োজন হত বৈশাখী মেলার। এটুকুর মধ্যে মূলত পহেলা বৈশাখ ছিল সীমাবদ্ধ।

আধুনিক যে পহেলা বৈশাখ উদযাপন, তার ভিত্তি রচিত হয় ১৯১৭ সালে। সে সময় ভারত উপমহাদেশ ছিল বৃটিশদের গোলাম। বিলেতি প্রভূদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের বিজয় কামনা করে পহেলা বৈশাখে হোমকীর্তন ও পূজা-অর্চনা করা হয়। ভারতীয় মুসলিমরা মানসিকভাবে ব্রিটিশ বিরোধী হওয়ায় পহেলা বৈশাখের মাধ্যমে ব্রিটিশ বন্দনা ও প্রার্থনায় অংশ নেয় নি। আমাদের দেশে ১৯৬৭ সালের আগে বর্তমানের মত ঘটা করে পহেলা বৈশাখ উদযাপনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১৯৬৭ সালে পাকিস্তানী শাকগোষ্ঠির অন্যায়, নিপীড়ন ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ রমনার বটমূলে নতুন আঙ্গিকে পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধের আগ পর্যন্ত পহেলা বৈশাখ উদযাপনের ভাষা ছিল প্রতিবাদের। কিন্তু স্বাধীনতার কয়েক বছর পর থেকে ধীরে ধীরে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হতে থাকে। যে সকল মাত্রা না এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত, না বাঙালি সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মূলত এসকল মাত্রা যোগ হয়েছে প্রভুদের প্রতি মানসিক দাসত্ব ও স্বদেশী বেনীয়াদের বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। পহেলা বৈশাখ এখন সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক উভয় আগ্রাসনের হাতিয়ার। বৈশাখী জামা-কাপড় ও ফ্যাশনের কথা বাদ দিলেও কেবল মাত্র পান্তাভাত ও ইলিশের পেছনে যে বিপুল অর্থ অপচয় হয়ে থাকে তা কি এদেশের নিত্য-অনাহারী মানুষের প্রতি এক ধরণের উপহাস নয়?

১৯৮৯ সাল থেকে ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটের উদ্যোগে আরও একটি মাত্রা যোগ হয়েছে মঙ্গল শোভাযাত্রা নামকরণে। বিভিন্ন মিডিয়ায় এই শোভাযাত্রাকে আবহমান গ্রামবাংলার গ্রামীণ জীবনের রূপকে ফুটিয়ে তোলার বিষয়টি উল্লেখ করে জোর প্রচারণা চালানো হয়। কিন্তু যারা মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন নি অন্তত পত্রপত্রিকায় ছবি ও টিভি চ্যানেল ভিডিও ফুটেজ দেখেছেন আশা করি তারা একবাক্যে স্বীকার করবেন মঙ্গল শোভাযাত্রায় যে সকল মূর্তি, মুখোস ইত্যাদি শোভা পায় সেগুলোর সাথে বাংলার গ্রামীণ জীবনের কোন মিল নেই। বরং একে রথযাত্রার দৃশ্যের সাথে মেলাতে কারো কষ্ট হবে না। শুধু তাই নয়, শোভাযাত্রার নাম দেয়া হয়েছে 'মঙ্গল' শোভাযাত্রা। এর উদ্দেশ্য জাতির নতুন বছরটি যে মঙ্গলময় হয়। কিন্তু এই মঙ্গল কামনা তারা কার কাছে করছেন এটিই এখন প্রশ্নবোধক?

অপরদিকে দেশমতৃকার সংস্কৃতি পরিত্যাগ করার সুযোগে একশ্রেণির ধর্মান্ধ ধর্মব্যবসায়িদের ফতোয়ার কবলে পড়ে পহেলা বৈশাখ তথা ফসলী সনকে অনেকে অবৈধ, নাজায়েজ ইত্যাদি বলে প্রচারণা চালান। কিন্তু তাদের এই ফতোয়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণথেকে কতটুক যৌক্তিক তার সূত্র যাচাই না করেই একে নাজায়েজ বলে ধরে নিচ্ছেন তাও সমীচীন নয়। এই দুই শ্রেণির দ্বন্দ্বে পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব গিয়ে পড়েছে বিদেশী বেনিয়াদের খপ্পরে। ফলে নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে পহেলা বৈশাখ পালনের নামে অপসংস্কৃতির যে পরগাছা বেড়ে উঠছে সেদিকে কেউ দৃষ্টিপাত করছেন না। যেমনটি বাইবেলে সান্তাক্লজ নামে কোন চরিত্র না থাকলেও ইহুদী নিয়ন্ত্রিত বিশ্বখ্যাত কোকাকোলা কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্ট ধর্মে 'সান্তাক্লজ' নামক এক নতুন আইকন সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই পহেলা বৈশাখকে পুঁজি করে কেউ যেন সাধারণ মানুষের মাথায় লবন রেখে বরই খেতে না পারে সে বিষয়ে আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি ও মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা

উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী

বাঙালির ইতিহাসে ১৯৭১ সাল ছিল সর্বাধিক বেদনাদায়ক এবং একইসঙ্গে সর্বাধিক সাফল্যজনক একটি অধ্যায়। বেদনার বিষয় এই কারণে যে, এ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের লাগামহীন অত্যাচার-অবিচার ও জিঘাংসার শিকার হয়ে লাখো বাঙালিকে জীবন হারাতে হয়েছিল, সম্ভ্রম হারিয়েছিল অসংখ্য মা-বোন। বিধ্বস্ত হয়েছিল রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, বাড়ি-ঘর, স্কুল-কলেজসহ অসংখ্য স্থাপনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও বছরটি বাঙালির জাতীয় পথচলায় স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে অমর হয়ে আছে আমাদের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধ ও তৎলব্ধ স্বাধীনতার কারণে। সেই একাত্তর আজও ষোল কোটি বাঙালির প্রাণের প্রেরণায় পরিণত হতে পারে। ঘুণে ধরা এই স্বার্থভিত্তিক সমাজে যখন অপরকে সুখী করতে কেউ স্বশরীরে একটি ফুলের আঁচড় নিতেও রাজি নয়, যখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো এ দেশের প্রতি ইঞ্চি মাটির দিকে শকুনের ন্যায় লোলুপ দৃষ্টি ফেলে রেখেছে, জাতির ঐক্য ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে, সন্ত্রাসীরা স্বজাতির নিরীহ মানুষগুলোকে আগুন দিয়ে ঝলসে দিচ্ছে, তখন একাত্তরের সেই নিঃস্বার্থ চেতনা বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। নিপীড়িত, অত্যাচারিত, জনমদুঃখী মানুষের মুক্তির জন্য রক্তে শিহরণ জাগানো সেই শ্লোগান আজ আবারও প্রাসঙ্গিক-

'মোরা একটি মুখের হাসির জন্য যুদ্ধ করি'।

স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি:

স্বাধীনতা যুদ্ধ হঠাৎ করে শুরু হয় নি, ৯ মাসের এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি হতে বহু বছর লেগেছে। শত শত অন্যায়-অবিচারের স্টিম রোলার চলেছে এ জাতির উপরে। পাকিস্তানিরা ক্ষমতালাভের পর থেকেই এ দেশের মানুষের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছে, অপশাসন চালিয়েছে তারই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি রচিত হয়েছে এই যুদ্ধের মাধ্যমে। অন্যায়, অবিচার, যুলুমের বিরুদ্ধে বাঙালির সোচ্চার কণ্ঠের এটি একটি পর্যায়মাত্র। বস্তুত পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ কেবল ৯ মাস নয়, বহু বছর ধরে চলেছে। সে যুদ্ধ ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ, স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বুঝতে হলে আমাদেরকে আরও আগে থেকে শুরু করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, দীর্ঘ প্রায় আড়াইশ বছর সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ

শক্তি আমাদেরকে শোষণ করেছে। এ দেশের সম্পদ পাচার করে নিজেদের দেশকে সমৃদ্ধ করেছে, আর আমাদেরকে উপহার দিয়েছে ক্ষুধা-দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ। কোটি কোটি মানুষকে মরতে হয়েছে শুধু ক্ষুধার জ্বালায়। আমাদের মান-সম্মানকে বুটের তলায় পিষ্ট করেছে, আমাদের প্রতিবাদী কণ্ঠ রুদ্ধ করেছে। বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা বারবার পদদলিত হয়েছে। এরপর যখন ব্রিটিশরা চলে গেল, বলা হলো- তোমরা স্বাধীন। আমরা স্বভাবসুলভ সরল হৃদয়ে সে কথা বিশ্বাস করলাম।

ইসলামের সুমহান আদর্শ- সাম্য, ন্যায়বিচার, সম্পদের সুষম বণ্টন ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ এই অঞ্চলের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ইসলামী জীবনাদর্শ উপহার দেওয়ার কথা বলে ভারত থেকে স্বাধীন জাতিসত্ত্বা নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি দেশ গঠন করা হলো। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান উভয় ভূখণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষই মুসলমান। তারা এক আল্লাহকে সেজদাহ করে, একই দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়ে। তারা এমন নবীর উম্মত যাঁর স্পষ্ট নির্দেশ- মুসলমান ভাই ভাই, মুসলমানের রক্ত ও মান-মর্যাদা একে অপরের জন্য হারাম (পবিত্র)। কাজেই ভাষা, সংস্কৃতি ও ভূ-খণ্ডের ফারাক ধর্মের মেলবন্ধনকে ছিন্ন করতে পারবে না এমনটাই ভাবা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে হলো ঠিক উল্টোটা। একই ধর্মের মানুষ হিসেবে ভাই ভাই হয়ে বসবাস করার যে আশা করা হয়েছিল তা উবে গেল অল্প দিনেই। প্রতারক, স্বার্থবাজ, পাকিস্তানের নেতারা অচিরেই ভুলে গেল আল্লাহ ও আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে প্রদত্ত ওয়াদার কথা। পাকিস্তানি শাসকরা মুখে মুখে ধর্মকে আলিঙ্গন করে রাখলেও, অল্প দিনেই কার্যত ধর্মের শিক্ষা বিসর্জন দিয়ে মেকি লেবাস পড়ে ঘোর অধর্মের ডাল-পালা বিস্তার করল। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক- সকল দিক দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে পদে পদে বঞ্চিত করা শুরু হলো। ব্রিটিশ শোষকদের প্রেতাত্মা ভর করল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উপর। ঔদ্ধত্য তাদেরকে এতটাই অন্ধ করে দিল যে, এ দেশের শত বছরের নির্যাতিত, নিপীড়িত সহজ-সরল মানুষের বুকে গুলি চালাতেও তারা দ্বিধা করল না। ভাষার জন্য, ভোটের অধিকারের জন্য, সর্বপোরি ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বারবার বাঙালির রক্ত ঝরতে লাগল। এরই ধারাবাহিকতায় রচিত হলো ৫২'র ভাষা আন্দোলন, '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০ এর নির্বাচন এবং '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট। যখনই পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ দেশের নিরীহ মানুষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ছক এঁকেছে, এ দেশের কোটি কোটি মানুষ সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ফলে পাকিস্তানি শোষকরা ব্যর্থতার গ্লানিতে জ্বলে অস্ত্রের ভাষায় নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছে। সারা বিশ্ব দেখেছে- বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়ে দৃঢ়তার সাথে শোষকদের প্রতিটি বুলেটকে হজম করেছে, কিন্তু পিছপা হয় নি। ঐক্যের শক্তির বারবার পরাজিত করেছে অস্ত্রের শক্তিকে, এমনকি পরাজিত করেছে ১৯৭১ সালেও।

স্বাধীনতার চেতনা মানে কি ধর্মহীনতা?

একাত্তরে এই জাতির সংগ্রাম ছিল অন্যায়, অবিচার, অনাচার, যুলুম, নির্যাতন তথা অসত্যের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কোটি কোটি নিরীহ ও শোষিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর সংগ্রাম। সেই সাথে সেটা ছিল ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা এবং তাদের এ দেশীয় দোসররা ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের সকল অপকর্মকে জায়েজ করতে চেয়েছিল। কিন্তু এ দেশের মানুষ ধর্মান্ধের মতো তাদের অন্যায় মেনে নেয় নি। কোনটা ধর্ম, কোনটা ধর্মব্যবসা- বাংলার লাখো কোটি জনতা তা ভালোভাবেই বুঝেছিল। তাই এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ধর্মব্যবসায়ীরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়। অর্থাৎ একাত্তরের চেতনা ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় হলো- আজ অত্যন্ত ক্ষুদ্র একটা শ্রেণি একাত্তরের চেতনা বলতে ধর্মহীনতা বলে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন। অথচ বাস্তবতা হলো– ধর্মহীনতা এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার চিন্তা-চেতনা, ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামবিদ্বেষী, ধর্মবিদ্বেষী কিছু লেখক-সাহিত্যিকের গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক, ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়ার প্রচারণা এবং ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবে বর্তমানের তরুণ প্রজন্মের সামনে থেকে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা কার্যত উধাও হয়ে গেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে কৌশলে দেশপ্রেমিক তরুণদের মধ্যে ধর্মহীনতার বিষবাস্প ছড়িয়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস চলছে।

আমরা সকলেই জানি- মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে মুক্তির লক্ষ্যে। কী থেকে মুক্তি? যে কোনো অন্যায়, অসত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি, তা সামাজিক হোক, রাজনৈতিক হোক বা ধর্মীয় হোক। একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী দুর্নীতি করলে তার দায়ভার যেমন ওই সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান নেবে না, ওই দুর্নীতিবাজ কর্মচারীকে নিতে হবে, তেমনই ধর্মের দোহাই দিয়ে যদি কেউ অপকর্ম করে তার দায়ভারও ধর্ম নেবে না, এর জন্য দায়ী করতে হবে ওই ধর্মব্যবসায়ীদেরকে। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, যুগে যুগে ধর্মই মানুষকে অসত্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে সত্যের আলোয় আলোকিত করেছে। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি নিজেদের ধর্মহীন দল হিসেবে প্রচার করতো তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা তো পরের কথা, শোচনীয়ভাবে পরাজিত হতে হতো এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। একইভাবে লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ধর্মহীনতার চেতনা নিয়ে যুদ্ধ করেছে- এমন ধারণাও নিতান্তই অর্বাচীনসুলভ। বরং একাত্তরের চেতনা হলো সকল অন্যায়-অবিচার আর অধর্মের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং ঐক্যবদ্ধ থাকার চেতনা; সংখ্যা গরিষ্ঠ সংখ্যা লঘিষ্টের পার্থক্য না করার চেতনা; ধনী-দরিদ্রের মাঝে বৈষম্যমূলক ব্যবধান না করার চেতনা; কোন অপশক্তির কাছে মাথানত না করার চেতনা। কাজেই একাত্তরের চেতনার সাথে ধর্মহীনতাকে জুড়ে দেওয়ার অপপ্রয়াস থেকে সকলের বের হয়ে আসা উচিত।

লেখক: উপদেষ্টা, দৈনিক বজ্রশক্তি।

রসুল (স:) এর দরবার ছিল নারীদের জন্য উন্মুক্ত। সেখানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন। রসুলের (স:) সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় এমামুয্যামান মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী হেযবুত তওহীদের সকল কর্মকাণ্ডে নারীদের সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন।

জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা

ফাহমিদা পান্না

যাবতীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। প্রকৃত ইসলাম নারীকে দিয়েছে মুক্তি ও স্বাধীনতা। কিন্তু এই সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় বিধিবিধানের নামে নারীদের মর্যাদা ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। সেই অচলায়তন ভেঙ্গে নারী এককভাবে পুরুষের পাশাপাশি সাহসী ভূমিকা পলন করছে হেযবুত তওহীদের নারীরা। এই নিবন্ধে তাই তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

রসুলাল্লাহর সময় নারীরা কেমন ছিলেন?

রসুলাল্লাহর সময় নারীরা মহানবীর সামনা সামনি বসে আলোচনা শুনতেন, শিক্ষাগ্রহণ করতেন, মহানবীকে প্রশ্ন করে জরুরি বিষয় জেনে নিতেন, অনেক জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শও দিতেন। এ সময় রসুলাল্লাহ ও মেয়েদের মাঝে কোনো কাপড় টাঙ্গানো ছিল এই ব্যাপারে কেউ কোনো দলিল দেখাতে পারবে না। নারীরা মসজিদের পাঁচ ওয়াক্ত জামাতে, জুমা'র সালাতে, দুই ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতেন। তারা পুরুষের সঙ্গেই হজ্ব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন, যেটা এখনও চালু আছে; তারা কৃষিকাজে, শিল্পকার্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সমস্ত কাজ তারা ইসলামের নির্দেশিত হেজাবের সাথেই করতেন। এমনকি রসুলাল্লাহর নারী সাহাবীরা পুরুষ সাহাবীদের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে সমানতালে অংশগ্রহণ করেছেন। মসজিদে নববীর এক পাশে তৈরি করা হয়েছিল যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা। এই বিশেষ চিকিৎসা ইউনিটে অধ্যক্ষ ছিলেন একজন নারী। অথচ আজ বিকৃত অতি পরহেজগার নারীদের এই ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই। বর্তমান ইসলামে যে নারী যত আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢেকে গৃহ-অভ্যন্তরে অবস্থান করবেন তিনি তত বড় পরহেজগার হিসেবে গণ্য হন।

হেযবুত তওহীদের নারীদের কর্মকাণ্ড:

হেযবুত তওহীদের মেয়েরা আন্দোলনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এমামুয্যামান সব সময় চেষ্টা করেছেন পুরুষদের পাশাপাশি যেন মেয়েরাও অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। নারীরা মহানবীর সঙ্গে থেকে বিস্ময়কর বিপ্লব সম্পাদনে যে ভূমিকা রেখেছেন, তা এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের মোজাহেদাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হেযবুত তওহীদের মেয়েরা শহরে এবং প্রত্যন্ত এলাকায় বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে তওহীদের বালাগ দিয়েছেন। মেলায়, মার্কেটে গিয়ে বই বিক্রি করেছেন, হ্যান্ডবিল বিতরণ করেছেন। তওহীদের বালাগ দিতে গিয়ে পুরুষদের সাথে অনেক মেয়েও হাসিমুখে জেল, জুলুম, ধর্মব্যবসায়ী আলেম ওলামাদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছেন, ঘরবাড়ি

থেকে উচ্ছেদ হয়েছেন, নিজের ঘরবাড়ি ও পরিবার থেকে বহিস্কৃত হয়েছেন। অনেকে স্বামী, সন্তান, সংসার পর্যন্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, যেটা মহানবীর অনেক নারী সাহাবীর ক্ষেত্রেও হয়েছিল। মানবজাতির কল্যাণের জন্য, মানবজীবনে সত্য প্রতিষ্ঠা করে সুবিচার ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদের আরাম-আয়েশ ও বিলাসিতার জীবন ত্যাগ করে অনেক মেয়ে কঠিন সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ পথ বরণ করে নিয়েছেন।

উপার্জনে মেয়েরা:

পুরুষরা ব্যস্ত ১৬ কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে। দিন নেই, রাত নেই কেবলই সংগ্রাম, সত্য প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার বেসাতি ধ্বংসের সংগ্রাম। কিন্তু পরিবার চলবে কী করে? উপার্জন করবে কে? বেঁচে থাকতে হবে তো। কিছু উপায়-উপার্জন তো করতেই হবে। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, এই উপার্জনের দায়িত্ব তখন কাঁধে তুলে নিয়েছেন হেযবুত তওহীদের নারীরা। পিঠা বিক্রি করে, দোকানে দোকানে, রাস্তা-ঘাটে, বাড়িতে বাড়িতে বই-পুস্তক বিক্রি করে, খেলনা বিক্রি করে, পত্রিকা-ম্যাগাজিন বিক্রি করে হলেও আল্লাহর রাস্তায় নিবেদিত স্বামী-সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিয়েছেন তারা। আল্লাহর রহমে অনেক সদস্যা পরিবারের খরচ যোগানোর পর তার নিজের উপার্জন থেকে আন্দোলনের ফান্ডেও অর্থপ্রদান করে সত্য প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখেছেন। ধর্মীয় কুসংস্কারসহ অন্যান্য পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের সমাজে এখনও নারীদের আয়-উপার্জনকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। বিশেষ করে ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণিটি বাড়ির বাইরে গিয়ে নারীদের উপার্জনের বিরোধিতায় লিপ্ত। ধর্মের লেবাসধারী এই অধার্মিকরা, জাতির অর্ধেক নারীকে কার্যত অক্ষম করে রাখতে চায়। তাই হেযবুত তওহীদের নারীদের জন্য কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। অনেক স্থানেই ধর্মব্যবসায়ী ও তাদের দ্বারা প্রভাবিত কার্যত ধর্মান্ধরা, হেযবুত তওহীদের নারীদেরকে নিয়ে কটূক্তি করেছে, এমনকি গালাগাল পর্যন্ত করেছে। কিন্তু হেযবুত তওহীদের মোজাহেদারা সত্যের ধারক, সত্যের বাহক, তাই সত্য কাজ নিয়ে কোনো হীনম্মন্যতা তাদের নেই। কে কী বলল, কে কী মনে করল তা না দেখে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকেই পরম পাওয়া ভেবে নিশ্চিন্তে পুরুষদের পাশাপাশি উপার্জনে শরীক হয়েছেন।

জাতীয় অস্থিতিশীলতা নিরসনে দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের নারীরা:

বাংলাদেশের জনগণকে প্রায়শই রাজনৈতিক অচলাবস্থার মাঝে পড়তে হয়। ধ্বংস হয় কোটি কোটি টাকার সম্পদ, রুদ্ধ হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক গতি। জ্বালাও-পোড়াও, অগ্নিসংযোগ, হরতাল, অবরোধের সর্বনাশা আগুনে জ্বলে ছাই হয় শত শত নিরাপরাধ প্রাণ। এই সবকিছুর প্রধান কারণ হলো জাতীয় অনৈক্য। তাই এ অবস্থা থেকে জাতিকে রক্ষা করতে চাইলে সর্বপ্রথম করণীয় হচ্ছে জাতিকে ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ করা। জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার এই সময়োপযোগী কাজেই নেমেছে হেযবুত তওহীদ, আর তাতে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে আন্দোলনের নারী সদস্যরা। মুমূর্ষু এই জাতির জীবন ফিরে পাবার একমাত্র মহৌষধ নিয়ে পুরুষদের পাশাপাশি দেশজুড়ে ছুটে চলেছে হেযবুত তওহীদের

রাজধানীতে বিভিন্ন দলের স্থানীয় নেত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন দৈনিক বজ্রশক্তির উপদেষ্টা উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী।

নারীরা। তারা ছুটছে পথে-প্রান্তরে, নগরে-বন্দরে, মন্ত্রী-এমপি-পুলিশ প্রধানের কার্যালয় থেকে শুরু করে জেলা-উপজেলার সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, অফিস-আদালত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, শিক্ষক, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, ছাত্র, সাংবাদিক, আইনজীবী, কৃষক, শ্রমিক পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের কাছে। এমনকি গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষগুলোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তারা সঙ্কট নিরসনে সকলকে সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান পৌঁছে দিচ্ছেন।

এর আগে ২০১৩ সালে দেশব্যাপী রাজনৈতিক সঙ্কট প্রকট আকার ধারণ করলে, ক্রমাগত হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও-পোড়াও, অগ্নিসংযোগ, সংঘাত-সংঘর্ষ অসহনীয় মাত্রায় পৌঁছে গেলে সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা যখন নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় যেতে ভয় পাচ্ছিলেন, সরকারি দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা সহিংসতা দমনে ভূমিকা না রেখে উল্টো সাধারণ মানুষকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে গ্রাম ছাড়ছিলেন তখন দেশবাসীর বিপর্যয় ঘোঁচাতে হাত বাড়িয়েছিল হেযবুত তওহীদ। তখন হেযবুত তওহীদের মেয়েরা শান্তি প্রতিষ্ঠায় যে সাহসিকতার নজির স্থাপন করেছেন তা ইতিহাসে বিরল। তারা রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জেলা-উপজেলা শহর, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ ইত্যাদিতে গিয়ে হাজার হাজার বার জনসচেতনতামূলক ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, পেশাজীবী সংগঠন ও সংস্থা, প্রশাসনসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠান করে সকলের শর্তহীন সমর্থন পেয়েছেন। হেযবুত তওহীদের মেয়েদের দ্বারা এমন হাজার হাজার ডকুমেন্টারি প্রদর্শন ও আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে যেগুলোতে উপস্থিত লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের দু'হাত তুলে ঐক্যবদ্ধ হবার ঘোষণা দিয়েছেন। পরবর্তীতে সহিংসতা-সন্ত্রাস কমে আসার অন্যতম কারণ ছিল হেযবুত তওহীদের এই দেশব্যাপী প্রচার-প্রচারণা, যে কথা পরবর্তীতে অনেক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাই বলেছেন। সারা দেশ যখন আতঙ্কিত, অতি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ বাইরে বের হয় না, রাজনীতিক দলের নেতাকর্মীরা এলাকায় যেতে ভয় পাচ্ছিল, প্রশাসনের গলদঘর্ম অবস্থা ঠিক সেই সময়ে হেযবুত তওহীদের মেয়েরা ষোল কোটি বাঙালির সামনে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। জীবনের পরোয়া না করে শুধুমাত্র মানুষের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে এমন উদ্যোগ কেবল হেযবুত তওহীদের মেয়েদের পক্ষেই নেওয়া সম্ভব। কারণ তারা যামানার এমামের অনুসারী, তারা ইসলামের সেই আকীদাই পেয়েছেন, যে আকীদা পেয়ে রসুলের নারী আসহাবরা তাঁবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে ফেতনাবাজ শত্রুসেনাকে পরাস্ত করেছিল।

এ ছাড়া দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদ ও হেযবুত তওহীদের মিডিয়া পার্টনারের আয়োজনে যত সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার অধিকাংশেরই উপস্থাপনা, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করেছেন মেয়েরা। অনেক সেমিনারে প্রধান বক্তা হিসেবেও বক্তব্য রেখেছেন আন্দোলনের নারী সদস্য। জাতির ক্রান্তিলগ্নে ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে মানবতার কল্যাণে হেযবুত তওহীদের নারীদের এই আত্মনিবেদন মহান আল্লাহ অবশ্যই সফল করবেন।

আল্লাহর নির্দেশিত হিজাবের যথাযথ বাস্তবায়ন:

বর্তমানে বিকৃত পর্দাপ্রথার অজুহাতে আলেম-মোল্লারা মেয়েদেরকে গৃহকোণে বন্দি করে রাখতে চায়। তারা যে পদ্ধতিতে বোরকা দিয়ে মেয়েদেরকে মুড়ে রাখতে চায় তা আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বৈধ নয়। সুরা নূরের ৩১ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, মো'মেন নারীগণ যেন তাদের শরীরের সাধারণত প্রকাশমান অংশ ব্যতীত তাদের আভরণ বাইরে প্রকাশ না করে এবং তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ কাপড় দ্বারা আবৃত করে। সাধারণত প্রকাশমান বলতে এখানে হাত, মুখমণ্ডল, পায়ের গোড়ালী ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে। তাই এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের নারীদেরকে এভাবেই হেজাব করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সে মোতাবেক হেযবুত তওহীদের সকল মেয়েরাই আন্দোলনের কাজে বা ব্যক্তিগত কাজে বাইরে গেলে আল্লাহর নির্দেশিত পদ্ধতিতে হেজাব করার চেষ্টা করে। মুখমণ্ডল ঢেকে রাখলে মানুষকে চেনার উপায় থাকে না, তাই আল্লাহর নির্দেশমত না করে বাড়িয়ে বা কমিয়ে হেজাব করা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা।

আন্দোলনের আলোচনা-অনুষ্ঠানে নারীরা:

হেযবুত তওহীদের মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে একত্রে এমামুয্যামানের আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন, সালাহ কায়েম করেছেন। কখনও কখনও শুধু মেয়েদেরকে নিয়েও এমামুয্যামান আলোচনা করেছেন, সেখানে মেয়েরা তাদের পারিবারিক নানা সমস্যার বিষয়ের সমাধান এমামের কাছ থেকে শুনেছেন, নিজেদের দীন সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের উত্তর জেনে নিয়েছেন। এ কথা ভুললে চলবে না যে, জাতির প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। একজন মানুষের একটি পা কেটে ফেলে দিলে সে যেমন চলতে পারে না, তেমনি এ জাতিটিও মেয়েদেরকে স্বেচ্ছায় গৃহনির্বাসন দিয়ে নিজেদের একটি পা-ই কেটে ফেলেছে। কবি নজরুল এজন্যই বলেছেন,

"সে গৌরবের গোর হয়ে গেছে আঁধারের বোরকায়
আঁধার হেরেমে বন্দিনী হলো সহসা আলোর মেয়ে,
সেইদিন হতে ইসলাম গেল গ্লানির কালিতে ছেয়ে
লক্ষ খালেদা আসিবে যদি এ নারীরা মুক্তি পায়।"

এছাড়া হেযবুত তওহীদের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে সমস্ত রান্না মেয়েরাই করে থাকে। কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা, সেবাপ্রদান ইত্যাদি কাজেও মেয়েরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

লেখক: হেযবুত তওহীদের সদস্য।

মানবতার কল্যাণে ধর্ম শান্তির জন্য সংস্কৃতি

এক জমজমাট সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

গান পরিবেশন করছেন লালন সম্রাজ্ঞী ফরিদা পারভীন

এক মোহনায় ধর্ম লালনগীতি ও চলচ্চিত্র

রাকিব আল হাসানঃ
দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর রাত ৮ টায় মঞ্চে উঠলেন লালন সম্রাজ্ঞী ফরিদা পারভিন। করতালির ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল তেজগাঁও কলেজ মিলনায়তন। বিকেল ৩ টা থেকে রাত ৮ টা- আলোচনা, গান, নাটিকা ইত্যাদি মনোমুগ্ধকর সব পরিবেশনার মধ্যেও বার বার উপস্থাপকের মুখে যার নামটি উচ্চারিত হচ্ছিল তিনি এখন মঞ্চে। তার গান শোনার জন্য দর্শক-শ্রোতার সাথেই সেই দুপুর থেকে বসে আছেন অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বাংলাদেশের প্রখ্যাত অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামানও। গান পরিবেশনের পূর্বে শিল্পী ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে তার বাগ্মীতারও পরিচয় দেন। অতীত স্মৃতি, ফকির লালন সাঁইজির কিছু গানের ভাবার্থ আর আত্মিক পরিশুদ্ধির বিষয় উঠে আসে তার আলোচনার মধ্যে। সত্য বল, সুপথে চল ওরে আমার মন; সত্য কাজে কেউ নয় রাজি, সবই দেখি তা-না-না; সত্য-সুপথ না চিনিলে পাবিনে মানুষের দর্শন এই গানগুলির ভাবার্থ নিয়ে তিনি কথা বলেন।

গানের মাঝে মাঝেই তিনি ফকির লালন শাহ এর গানের বিভিন্ন শিক্ষামূলক অংশ উদ্ধৃত করে আলোচনা করেন। সেই আলোচনার মধ্যে উঠে আসে সমাজ সংস্কারের কথা, মানবতার কথা। তিনি তার বক্তব্যের এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানের আয়োজক হেযবুত তওহীদের সদস্য-সদস্যাদের উদ্দেশ করে বলেন, আপনাদের আত্মার পিতা মাননীয় এমামুয্যামানের আত্মা আমায় ডেকেছেন বিধায়, উনার আত্মা আমায় আদেশ করেছেন বিধায় আমার এখানে আসার সুযোগ হয়েছে। আমি আত্মা দিয়ে বিশ্বাস করি এই প্রতিষ্ঠান, এই আন্দোলন একদিন পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেবে। যাদের আত্মার সাথে আত্মার সম্পর্ক থাকে তাদের প্রচেষ্টা কখনো বৃথা যেতে পারে না।

গত ১০ এপ্রিল হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে তেজগাঁও কলেজ মিলনায়তনে 'মানবতার কল্যাণে ধর্ম - শান্তির জন্য সংস্কৃতি' শীর্ষক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ছিল এক ভিন্ন রকম আয়োজন। একই মঞ্চে মিলিত হন ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের অনন্য ব্যক্তিগণ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান বিচারপতি জনাব তাফাজ্জল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন

তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আবদুর রসিদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট অভিনেতা এ.টি.এম. শামসুজ্জামান, বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী লালন সম্রাজ্ঞী ফরিদা পারভীন, হেযবুত তওহীদের সাহিত্য সম্পাদক ও বিশিষ্ট কলামিস্ট, কবি ও সাহিত্যিক রিয়াদুল হাসান। আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বৃহত্তর তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক কমিশনার শামীম হাসান, ফরিদুর রহমান খান (ইরান), ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ-এর সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কবি মোশারেফ হোসেন আলমগীরসহ রাজনীতিক, গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক হিসাবে ছিলেন দৈনিক বজ্রশক্তির উপদেষ্টা রুফায়দাহ পন্নী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দৈনিক বজ্রশক্তির প্রকাশক ও সম্পাদক এস. এম. সামসুল হুদা।

একই মোহনায় যেন মিলিত হলো ধর্ম, লালনগীতি ও চলচ্চিত্র। আলোচকদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে গান, চলচ্চিত্রের ব্যাপারে ইসলামসহ সকল ধর্মের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি। সকলেই এই সত্যটি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হন যে, কোনো ধর্মেই গান, বাদ্য, চলচ্চিত্র, শিল্প-সংস্কৃতি নিষিদ্ধ নয় বরং এগুলিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। যদি এগুলি শান্তি প্রতিষ্ঠায় মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তবে তা ইবাদত বলেই গণ্য হবে। নিষিদ্ধ তো কেবল সেই গান, সেই সাহিত্য, সেই চলচ্চিত্র যা সমাজে অশ্লীলতা ও অশান্তি বৃদ্ধি করে।

"আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময়" এই গান দিয়েই সকল প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে শুরু হয় ফরিদা পারভীনের লালনগীতি পরিবেশনা। সকলে যেন স্তব্ধ হয়ে গানের ভুবনে ডুবে ছিল কিছু সময়ের জন্য। এরপর একের পর এক "বেধেছে এমনও ঘর শূন্যের উপর...", "পারে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়", "শুনিলে প্রাণ চমকে ওঠে",

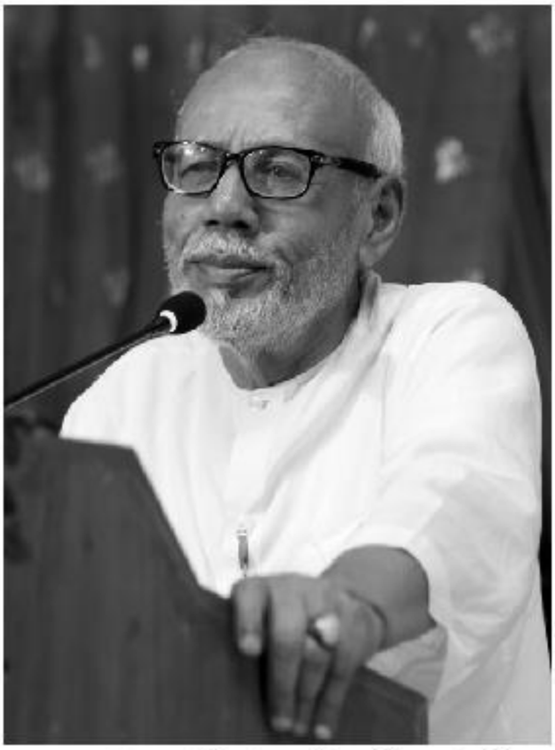

বক্তব্য রাখছেন খ্যাতিমান চলচ্চিত্র অভিনেতা এ.টি.এম শামসুজ্জামান

"একটা বদ হাওয়া লেগে খাচায়" গানগুলি সকলকে মুগ্ধ করে। কখনো গানের ভাব অনুধাবনে চক্ষু বন্ধ করে নীরব শ্রবন আবার কখনো বা গানের বাজনার তালে তালে করতালি আর শরীর দুলিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করছিল হল উপচেপড়া দর্শকেরা। "মিলন হবে কত দিনে, আমার মনের মানুষেরও সনে" মন মাতানো এই গানটি দিয়ে শেষ হয় বর্ণাঢ্য এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর্ব।

মঞ্চ নাটকে অভিনয় করছেন হেযবুত তওহীদরে সদস্য ও তওহীদ সাংস্কৃতিক দলের কর্মীরা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আলোচনায় রিয়াদুল হাসান

সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, অভিনয় গোনাহের কাজ নয়

আমাদের সমাজে যারা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন তাদের অনেকের মধ্যেই একটা দ্বিধা ও অপরাধবোধ আজীবন কাজ করে। কেননা তারা মনে করেন যে, তারা খুব গোনাহের কাজ করছেন। তারা শেষ বয়সে ধর্মকর্মে মনোযোগ দেন। শিল্পানুরাগ ও অপরাধবোধ, এই উভয়সঙ্কটে পড়ে আমাদের শিল্পীদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে না। আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে সম্ভ্রান্ত পরিবারের কোনো মুসলিম মেয়ের পক্ষে নাচ-গান, সিনেমা নাটকে অভিনয় করা কতটা দুষ্কর ছিল তা সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন। এক কথায় শিল্প ও সংস্কৃতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফতোয়াবাজদের চোখরাঙানি।

আবার অনেক সংস্কৃতিমনা মানুষ আছেন যারা ধর্মের নামে চলা এই কূপমণ্ডূকতাকে মেনে নিতে না পেরে পুরোপুরি ধর্ম বিদ্বেষী হয়ে গেছেন। তারা দেখছেন ভাস্কর্য আক্রান্ত হয়েছে ধর্মান্ধ গোষ্ঠী দ্বারা। এমনকি রমনা বটমূলে, বিভিন্ন সিনেমা হলে বোমা মারা হয়েছে। এসব দেখে যুক্তিশীল মানুষ ভাবছেন, ধর্ম হচ্ছে কুসংস্কার। তারা এই ধর্মবিদ্বেষ প্রকাশ করছেন ব্লগে, পত্রিকায়, বক্তব্যে, লেখায়, চলচ্চিত্রে। এ থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি আহত হচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ীরা ধর্ম গেল ধর্ম গেল শোর তুলে দাঙ্গা সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে।

এ বিষয়ে হেযবুত তওহীদের বক্তব্য হচ্ছে, বর্তমানে ধর্মের নামে যা চলছে সব অধর্ম। ধর্মই সকল সংস্কৃতিকে স্থাপন করেছে। মানুষের সৃষ্টিশীলতার শৈল্পিক প্রকাশ আল্লাহর নেয়ামত ঠিক যেভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মও আল্লাহর নেয়ামত। এগুলোর ব্যবহারের উপর এর ভালোমন্দ নির্ভর করে। মানুষ আজ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করছে ধ্বংসাত্মক কাজে, ধর্ম নিয়ে ব্যবসা করছে আর শিল্প, সাহিত্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে অশ্লীলতা, মিথ্যা ও অন্যায়। ফলে অপরাধের বিস্তার ঘটছে। যে সমস্ত কর্মকাণ্ড সমাজে অপরাধ বিস্তার ঘটায়, হানাহানি সৃষ্টি করে সেটা নাটক হোক, চলচ্চিত্র হোক, সাহিত্য হোক, গান হোক, শিল্পকলা হোক যেটাই হোক সব নিষিদ্ধ। এটা শুধুই ধর্মে নয় বিশ্বের সমস্ত আইনেও নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে।

এবার আসুন দেখা যাক, আল্লাহর রসুল কি সঙ্গীত, শিল্প সাহিত্যের প্রতি বিরূপ ছিলেন? এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে তিনি ছিলেন মানব ইতিহাসের ব্যস্ততম মহামানব যাঁর নবী জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে, যুদ্ধে। মদীনা জীবনের গড়ে প্রতি ৩২ দিনে তাঁকে একটি করে যুদ্ধ সংঘটন করতে হয়েছিল। তিনি ছিলেন যেমন একদিকে সফল বিপ্লবী, সফল রাষ্ট্রনায়ক; তেমনি দুর্ধর্ষ এক সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি। তাঁর পক্ষে সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি শিল্পচর্চা নিয়ে মেতে থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বলে কি তিনি এগুলো নিষিদ্ধ করেছিলেন? কখনোই নয়। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি বাদ্য সহযোগে গান শুনেছেন এমন ভুরি ভুরি উদাহরণ তাঁর পবিত্র জীবনে রয়েছে। আরবের বিভিন্ন জাতীয় দিবসগুলোতে, বিবাহে, যুদ্ধে সর্বত্র গানের চর্চা ছিল। অথচ বর্তমানে কেবল হামদ-নাত জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াকেই আলেমগণ বৈধ বলে মনে করে থাকেন। তাদের কাছে স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি বা পহেলা বৈশাখের গান দূরে থাক, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াও কাম্য নয়। অথচ ইমাম গাজ্জালী 'এহইয়াও উলুমদ্দিন' গ্রন্থে লিখেছেন, "কোকিলের সুর শোনা যেমন হারাম নয়, তেমনি মানুষের ইচ্ছা মোতাবেক কণ্ঠ নিঃসৃত সুর শ্রবণ করাও হারাম নয়। মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সুর, বিভিন্ন তারযন্ত্রের ওপর আঘাত বা ঘর্ষণজনিত আওয়াজ, দফ, তবলা বা অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজও হারাম নয়"।

সংস্কৃতি এমন একটা শক্তিশালী মাধ্যম যে মাধ্যম দিয়ে আমরা সত্য প্রকাশ করতে পারি। একজন লেখকের কলমের কালি যদি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র হয়, তবে একজন গায়কের গান কেন নয়? যদি সেই শিল্পীর গান মানুষকে মানবতার কল্যাণে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই গানও এবাদত। একই কথা অন্য শিল্প মাধ্যমগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। আল্লাহ যাদেরকে শিল্পপ্রতিভা দান করেছেন তাদেরকে এর হক আদায় করতে হবে। সেটা হলো, তাদের এই গুণকে স্বার্থহাসিলের জন্য ব্যবহার না করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্যাক্তি স্বার্থে প্রতিভা যদি ব্যয়িত হয় তবে স্রষ্টার দেওয়া এই জ্ঞান বা প্রতিভার হক নষ্ট করা হলো। এর জন্য স্রষ্টার কছে জবাব দিতে হবে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা সুন্দর একটা সাংস্কৃতিক জগত উপহার দিতে চাই। কিন্তু এটা আমাদের একার পক্ষে সম্ভব হবে না, শিল্পিমহলের সহযোগিতা লাগবে। আপনারা এগিয়ে আসলে আমরা পারবো ইনশাল্লাহ।

[হেযবুত তওহীদের সাহিত্য সম্পাদক রিয়াদুল হাসান গত ১০ এপ্রিল তেজগাঁও কলেজ মিলনায়তনে হেযবুত তওহীদ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভায় যে বক্তব্য প্রদান করেন তা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করা হলো।]

তেজগাঁও কলেজ মিলনায়তনে হেযবুত তওহীদ আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক প্রধান বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম

সকল ধর্মের মূলমন্ত্র মানবতা সংস্কৃতি ও শিল্পকলা জাতীয় উন্নতির মানদণ্ড

বিচারপতি তাফাজ্জল ইসলাম

"যারাই মানবতার কথা বলে এক শ্রেণির ফতোয়াবাজ তাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। বিদ্রোহী কবিও ফতোয়াবাজদের প্রচণ্ড বিরোধিতার শিকার হয়েছিলেন মানবতার কথা বলতে গিয়ে, তার বিরুদ্ধে হিন্দু, মুসলিম সব ফতোয়াবাজরা উঠে পড়ে লেগেছিল। অথচ তার গানের মর্মবাণী কোনো ধর্মের সাথেই সাংঘর্ষিক নয় বরং তার সেই কথার মধ্য দিয়ে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষাই ফুটে ওঠে। অথচ সেই কাজী নজরুল ইসলামই ফতোয়াবাজদের বিরোধিতার শিকার হলেন। তবুও তিনি হার মানেন নি, ধর্মকে ফতোয়াবাজদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিপ্লব এগিয়ে নিয়ে গেছেন, বহু কাজ করে গেছেন।

রসুলাল্লাহ তাঁর মদীনা সনদে অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কাজের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। আজকে ম্যাগনাকার্টাসহ অনেক কিছু হয়েছে, কিন্তু প্রথম হলো মদীনা সনদ। সেখানে বলা হলো যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে, রাষ্ট্র থেকে তোমাদেরকে বাধা দেওয়া হবে না। একটা দেশ কতটুকু সভ্য সেটা যেরকম যান্ত্রিক উন্নতির সাথে বা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে বিচার করা হয় একইভাবে সাংস্কৃতি বা শিল্পকলার মাধ্যমেও বিচার করা হয়। এই উপমহাদেশে মুসলমান শিল্পিরা ছিলেন সংগীতের শীর্ষে, ওস্তাদ আলা উদ্দিন খান, বড়ে গোলাম আলী তাদের মধ্যে অন্যতম।

একবার কুমিল্লা দাউদকান্দিতে আমার গ্রামের বাগান বাড়ির পাশে একটা মাদ্রাসায় ওয়াজ মাহফিল হচ্ছিল। লোকজনের অনেক অনুরোধে আমিও সেখানে অতিথি হিসাবে গেলাম। দেখলাম যিনি ওয়াজ করবেন তিনি ১২/১৪টা মাইক্রোবাস নিয়ে আসলেন, তার সাথে অনেক শিষ্য। শুরু হলো জ্বালাময়ী ওয়াজ, দশ মিনিটের মধ্যেই মানুষ কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। ওয়াজের মধ্যে বলা হচ্ছে যে, কালকের মধ্যেই আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুল থেকে নিয়ে এসে মাদ্রাসায় ভর্তি করাবেন। আমি সহ্য করতে না পেরে উঠে চলে আসলাম, পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, যিনি ওয়াজ করছেন তার ছেলে মেয়ে পড়ে বিলেতে। এখন চার দিকে এটাই ছড়িয়ে আছে, এটা আসলে কি মোনাফেকী, না অন্য কিছু? এখন মানবতার স্খলন চূড়ান্ত পর্যায়ে, নৈতিকতার স্খলনও চূড়ান্ত পর্যায়ে, দুটোই ভূলুণ্ঠিত। এখন আমার মনে পড়ছে সেই কবিতাটা, "আলোকের এই ঝর্ণাধারায় ধুইয়ে দাও। আপনাকে এই লুকিয়ে-রাখা ধুলার ঢাকা- ধুইয়ে দাও, ধুইয়ে দাও, ধুইয়ে দাও।"

ধর্ম মানুষকে শুদ্ধ করে অধর্ম মানুষকে নষ্ট করে

-এটিএম শামসুজ্জামান

ধর্ম মানুষকে শুদ্ধ করে, আবার ধর্মের নামেই মানুষকে নষ্ট করা হয়। ধর্ম মানুষকে সঠিক পথ দেখায় আবার ধর্মের নামেই মানুষকে বিপথগামী করা হয়। যদি ধর্মের সঠিক শিক্ষা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় তবে মানুষ শান্তিতে থাকবে, অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ পাব আমরা।

ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে সোচ্চার কিছু মানুষের সাথে এখানে একত্রিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ধর্মব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মানুষ আজ সচেতন হয়ে উঠছে। এটা আশার কথা। যা ইচ্ছা তা আর এখন জনগণকে বুঝাতে পারবেন না। ধর্ম মানে খুর দিয়ে পায়ের রগ কাটা নয়। ধর্ম মানে ককটেল মারা নয়। ধর্ম মানে পেট্রোল বোমা মেরে মানুষকে পোড়ানো নয়। বিশ্বের কোনো ধর্ম এর স্বীকৃতি দেয় না। পবিত্র কোর'আনে ফেতনা সৃষ্টি করতে নিষেধ করা হয়েছে। কোর'আনে বহুবার বলা হয়েছে, "তোমরা সীমা লঙ্ঘন করো না। সীমা লঙ্ঘনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।" কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীরা সীমা লঙ্ঘন করছেন।

হযরত মোহাম্মদ (সা.) যখন মে'রাজে গেলেন তখন আল্লাহ বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সব চেয়ে বেশি জাহান্নামি হবে নারী, তার পরে হবে আলেম, যাদের আমি এলেম দিয়েছিলাম, তাদের আমল ছিলো না। এই সমস্ত ধর্মজীবী আলেম হচ্ছে সেই লোকসকল যাদের আল্লাহ এলেম দান করেছেন কিন্তু তারা আমল করে না। আমি এদের বলি এখনো সময় আছে, শুধু উপদেশ না দিয়ে আমল করুন। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের দেশের একজন বড় আলেম বলেন নারী জাতি তেঁতুলের মতো। দেখে জিহ্বায় জল আসে। তবে কি আপনার পরিবারে কোনো মেয়ে নেই, তাদের ব্যাপারে যদি কেউ এমন নোংরা কথা বলে! কেমন লাগবে আপনার? আপনার স্ত্রীকে তেঁতুল বললে কি আপনার কেমন লাগবে?

অন্য ধর্মের ব্যাপারে কটাক্ষ করা ইসলামের নীতি বিরুদ্ধ। মুসলিম হয়ে যদি আমরা অন্য ধর্মের দেব-দেবীদের নিয়ে গালাগালি করি তবে অজ্ঞতা বসত সে আল্লাহকে গালাগাল করতে পারে। আমার নবীকে গালাগাল করতে পারে আর সে জন্যে দায়ী হবে কে? সব ধর্মকে ভালোবেসে নিজের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হবে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নারী

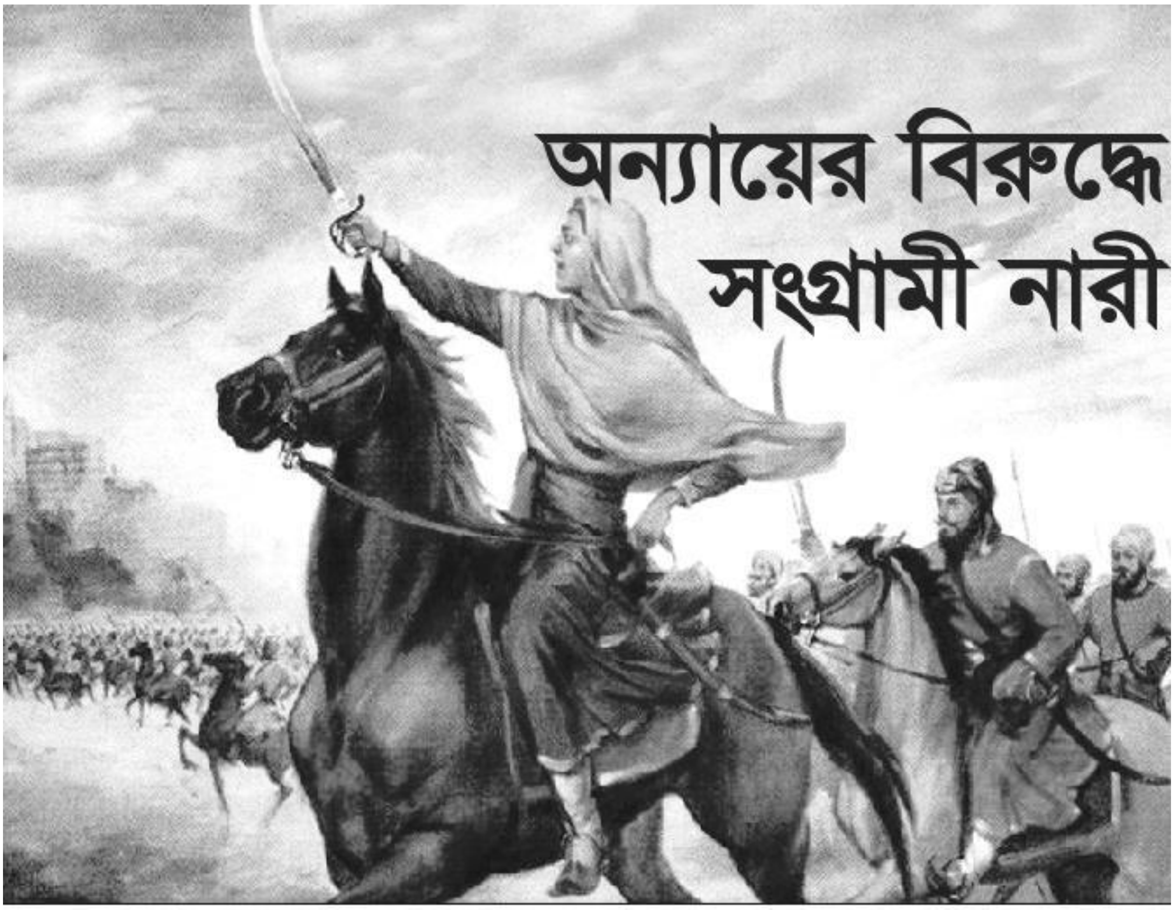

এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলার আগে দু'টি পূর্বসিদ্ধান্ত-

(১) পারিবারিক জীবনের বিধানে রাষ্ট্র চলে না, উভয় অঙ্গনে আলাদা বিধান লাগবে।

মানবজাতিকে আল্লাহ সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের মূল দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে শাসন করা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। এই মানুষের মধ্যে পৃথক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দু'টি সৃষ্টি- নারী ও পুরুষ। শান্তিপূর্ণ মানবসমাজ গঠনে এদের উভয়েরই স্রষ্টা কর্তৃক সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সেই দায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে অনুধাবন করেই মানবসমাজ যাত্রা শুরু করে। যে বিধান একটি পরিবারের জন্য প্রযোজ্য তা দিয়ে রাষ্ট্র চলতে পারে না, আবার রাষ্ট্রীয় একটি আইন পরিবারের মধ্যে প্রয়োগ করাও অযৌক্তিক হতে পারে। এই উভয় অঙ্গনের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকতেই হবে। সেই ব্যবস্থাগুলো আল্লাহ তাঁর প্রেরিতদের মাধ্যমে যুগে যুগে মানবজাতিকে দান করেছেন।

(২) ভারসাম্য আল্লাহর বিধানের একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। এই ভারসাম্য নষ্ট হলে ধর্ম অধর্মে পরিণত হয়।

আত্মিক চরিত্র ও জাগতিক বিধান উভয়ের বিস্ময়কর সমন্বয়ে গঠিত এই সনাতন, শাশ্বত জীবন ব্যবস্থা। মানবসমাজের এই ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ইবলিস প্ররোচনা দিয়ে এই দীনের ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। ফলে মানুষ ভুলে গেছে কার কি কর্তব্য ও স্রষ্টা নির্ধারিত দায়িত্ব। দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট না থাকলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা হতে বাধ্য। তাই অন্যায় অবিচারে ডুবে গেছে মানুষ। আল্লাহ আবার কোন নবী রসুল পাঠিয়ে সেই ভারসাম্যকে ফিরিয়ে এনেছেন। এভাবেই মানবজাতি লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে, একটার পর একটা যুগ অতিক্রম করে শেষ যুগে এসে উপনীত হয়েছে। বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা (দাজ্জাল) মানুষের জীবন থেকে সর্বপ্রকার নৈতিকতার শিক্ষাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং স্রষ্টা ও আখেরাতের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্ছেদ করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে সমাজে নারী ও পুরুষের কার কী অবস্থান, কার কী দায়িত্ব ও কর্তব্য তা মানুষ একেবারেই ভুলে গেছে। সকল ধর্ম বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে এ বিষয়ে স্রষ্টার দেওয়া মানদণ্ডও দুনিয়া থেকে হারিয়ে গেছে।

প্রচলিত বিকৃত ইসলামে নারী পুরুষের সঠিক অবস্থান নিয়ে বিস্তর মতভেদ আছে। তবে সকল আলেমই "সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াত"কে ভিত্তি হিসাবে উপস্থাপন করেন।

"আর-রেজালু কাওয়্যামুনা আলান্নেসায়ী"- ইসলামবিদ্বেষীরা এ আয়াতটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। এ আয়াতটির অনুবাদ করা হয়, "পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে। সে মতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে।" [সুরা নিসা: ৩৪]

ইসলামকে পশ্চাদপদ, নারীবিদ্বেষী মতবাদ, ইসলাম

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কায়েম করতে চায় ইত্যাদি পশ্চিমা গৎ বর্ণনা করতে করতে নারীবাদীরা মাইক্রোফোন সিক্ত করে ফেলেন, তারা তাদের বক্তব্যের পক্ষে এই আয়াতের উল্লেখ করেন। অপরদিকে কূপমণ্ডূক, খ্রিষ্টানদের শেখানো বিকৃত ইসলামের ধ্বজাধারী আলেম মোল্লারা নারী-ক্ষমতায়নের বিরোধিতা করতেও আশ্রয় নেয় এই আয়াতটির। আসুন আমরা এই শতবর্ষী বিতর্কের একটি বিরাম চিহ্ন টানি।

আমরা একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষকে যে কাজের দায়িত্ব দেই, একজন শিশুকে তা দেই না। কারণ তাদের শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতা ও সক্ষমতার তারতম্য। তারা উভয়েই একই পরিবারে থাকে কিন্তু উভয়ের কাজের ক্ষেত্র আলাদা। পরিবার হচ্ছে মানবসমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন। এই আয়াতে ইসলামে নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত পরিবারে কার কী অবস্থান, অধিকার ও কর্তব্য সে সম্পর্কে একটি মূলনীতি ঘোষিত হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কোন ভোগ্যবস্তু নয়, দাসীও নয়। এই আয়াতে আল্লাহ পুরুষের ক্ষেত্রে বিশেষণ ব্যবহার করেছেন 'কাওয়্যামুনা'। শাসক, কর্তৃত্বের অধিকারী, আদেশদাতা, ক্ষমতাশালী, নেতৃত্বের অধিকারী, Authority Power ইত্যাদি বোঝাতে আরবিতে আমীর, সাইয়্যেদ, এমাম, সুলতান, হাকীম, মালিক ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়। এখন আসুন দেখি আল্লাহ এসব কোন শব্দ ব্যবহার না করে 'পুরুষ নারীর কর্তা' বোঝানোর জন্য আল্লাহ 'কাওয়্যামুনা' শব্দটি কেন ব্যবহার করলেন। আল্লাহ কোন যুক্তিতে এবং কোন ক্ষেত্রে পুরুষকে নারীর উপরে কর্তৃত্বশীল করেছেন তা এর অর্থের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কাউয়ামুনা শব্দের অর্থ হচ্ছে সুঠাম ও সুডৌল দেহবিশিষ্ট, মানুষের গঠন কাঠামো, ঠেক্না, পরিচালক, ব্যবস্থাপক, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, শাসক, নেতা (আরবি-বাংলা অভিধান ২য় খণ্ড, পৃ ৫৩১- ই.ফা.বা.)। সুতরাং এই আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, পুরুষ শারীরিক দিক থেকে নারীর চেয়ে শক্তিশালী, তার পেশী, বাহু, হাড়ের গঠন, মেরুদণ্ড এক কথায় তার দেহকাঠামো নারীর তুলনায় অধিক পরিশ্রমের উপযোগী, আল্লাহই তাকে রুক্ষ পরিবেশে কাজ করে উপার্জন করার সামর্থ্য বেশি দান করেছেন, তাই পুরুষের দায়িত্ব হলো সে পুরুষ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করে, কঠোর পরিশ্রম করে রোজগার করবে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ভূমি কর্ষণ করে ফসল ফলিয়ে, শিল্পকারখানায় কাজ করে উপার্জন করবে এবং পরিবারের ভরণপোষণ করবে। এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই পুরুষকে আল্লাহ নারীর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছেন, নারীর অভিভাবক করেছেন। এটা মানব সমাজে বিশেষ করে পরিবারে পুরুষের বুনিয়াদি দায়িত্ব। অপরদিকে নারীদেরকে আল্লাহ সন্তান ধারণের উপযোগী শরীর দান করেছেন, সন্তানবাৎসল্য ও সেবাপরায়নতা দান করেছেন। তাই প্রকৃতিগতভাবেই তাদের মূল কাজ হচ্ছে সন্তানধারণ করা, তাদের লালন-পালন করা, রান্না-বান্না করা এক কথায় গৃহকর্ম করা। পবিত্র তওরাতেও নারী ও পুরুষের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যা পবিত্র কোর'আনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। সংসদ বাঙ্গালা অভিধানে স্বামী শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে পতি, ভর্তা, প্রভু, মনিব, অধিপতি, মালিক। আল্লাহর একটি সিফত হচ্ছে রাব্বুল আলামীন বা বিশ্বজগতের প্রতিপালক। আল্লাহ যেমন কোন প্রাণী সৃষ্টি করার আগেই তার রেজেকের বন্দোবস্ত করে রাখেন, কেবল আহার্য নয় জীবনোপকরণ হিসাবে তার যখন যা দরকার তাই তিনি নিরন্তর সরবরাহ করে যান। বিশ্বজগতে প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহর যে ভূমিকা, একটি পরিবারে আল্লাহরই প্রতিভূ (খলিফা) হিসাবে পুরুষেরও অনেকটা সেই ভূমিকা, কিন্তু ক্ষুদ্র পরিসরে।

সংসার ও বাস্তব সমরাঙ্গণে পুরুষ প্রথম সারি, নারী দ্বিতীয় সারি

সালাহ হচ্ছে উম্মতে মোহাম্মদী জাতিটির মডেল। এখানে প্রথম সারিতে পুরুষ এবং দ্বিতীয় সারিতে নারী। বাস্তব জীবনেও এই মডেলের রূপায়ণ ঘটা ইসলামের কাম্য। উপার্জন করা পুরুষের কাজ, তাই বলা যায় জীবিকার অঙ্গনে মেয়েরা দ্বিতীয় সারির সৈনিক। কখনও কখনও যদি অবস্থার প্রয়োজনে নারীকে প্রথম সারিতে গিয়ে জীবিকার লড়াইতে অবতীর্ণ হতে হয় সেটার সুযোগ আল্লাহ রেখেছেন। শোয়াইব (আ.) বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং তাঁর পুত্র সন্তান না থাকায় তাঁর দুই তরুণী কন্যা তাঁদের পশুপালের দেখাশোনা করতেন (সুরা কাসাস ২৩)। এছাড়া ইসলামের বিধান হলো স্বামীর উপার্জনের উপর স্ত্রীর অধিকার রয়েছে কিন্তু স্ত্রীর উপার্জনের উপর স্বামীর কোন অধিকার নেই। এখানেও নারীর উপার্জন করার অধিকারকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেওয়া হলো। রসুলাল্লাহর অনেক নারী আসহাব পরিবারে পুরুষ সদস্য না থাকায় বা পুরুষ সদস্যরা জেহাদে অধিক ব্যস্ত থাকায় নিজেরাই কৃষিকাজ করে, কুটির শিল্পের মাধ্যমে উপার্জন করতেন, অনেকে ব্যবসাও করতেন। রসুলাল্লাহর আহ্বানে সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তিনি একজন নারী, আম্মা খাদিজা (রা.)। তিনি তাঁর সকল সম্পদ আল্লাহর রাস্তায়, মানবতার কল্যাণে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, শিয়াবে আবু তালেবের বন্দীদশার তিন বছরে তিনি তাঁর ব্যবসার যাবতীয় পুঁজি পর্যন্ত শেষ করে ফেলেছিলেন। এ সময়ে খাদ্যাভাবের দরুন তিনি অত্যন্ত রুগ্ন হয়ে পড়েন এবং বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরেই পরলোকগমন করেন। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, তাঁর ইন্তেকালের কারণ ছিল অপুষ্টিজনিত অসুস্থতা। আবার ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম যিনি জীবন দিলেন, শহীদ হলেন তিনি একজন নারী, সুমাইয়া (রা.)।

এবার আসা যাক সত্যিকার যুদ্ধের ক্ষেত্রে। অন্যায়ের বিরুদ্ধের সংগ্রাম করার জন্যই উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টি। যে সংগ্রামমুখী নয় সে উম্মতে মোহাম্মদীর প্রাথমিক সদস্য হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না। যুদ্ধক্ষেত্রেও প্রথম সারিতে (Front Line) থেকে

সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়ার দায়িত্ব পুরুষদের। এখানেও কারণ পুরুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, শক্তি, সামর্থ্য, কষ্টসহিষ্ণুতা ইত্যাদি। জেহাদে নারীর স্বাভাবিক অবস্থান দ্বিতীয় সারিতে।

দ্বিতীয় সারির কাজের মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে রসদ সরবরাহ। যুদ্ধের বেলাতে রসদ সরবরাহকে যুদ্ধের অর্ধেক বলে ধরা হয়। সৈনিকদের খাদ্য, পানি, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধের আনুষঙ্গিক উপাদান সরবরাহ, আহতদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া, নিহতদেরকে দাফন করা ইত্যাদি সবই দ্বিতীয় সারির কাজ। রসুলাল্লাহর সময় নারীরা প্রায় সকল যুদ্ধেই প্রথমে এই দ্বিতীয় সারির দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা আহতদের চিকিৎসা দিয়েছেন, নিহতদের দাফনে সহায়তা করেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদেরকে পানি পান করিয়েছেন। তাছাড়া মসজিদে নববীর এক পাশে যুদ্ধাহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যার প্রধান ছিলেন একজন নারী রুফায়দাহ (রা.)। যোদ্ধাদেরকে যদি রসদ ও এই সেবাগুলো দিয়ে সাহায্য না করা হয় তবে তারা কখনোই যুদ্ধ করতে পারবে না। তাই যে কোন সামরিক বাহিনীতে এই দ্বিতীয় লাইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় সারির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো, প্রথম সারিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা। যে কোনো যুদ্ধজয়ের সবচেয়ে বড় উপাদান হলো সৈনিকদের আত্মপ্রত্যয়, মনোবল (Morale)। মনোবল না থাকলে সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝায় পরিণত হয়। দ্বিতীয় সারির বড় দায়িত্ব সৈন্যদের এই মনোবল বৃদ্ধি করা। আমরা আম্মা খাদিজার (রা.) কথা যদি বলি, দেখব যখন আল্লাহর রসুল নব্যুয়তের দায়িত্ব পেলেন, তিনি সারাদিন মানুষের কাছে সত্যের বাণী প্রচার করে সর্বত্র প্রত্যাখ্যাত হয়ে অবসন্ন হয়ে পড়তেন। সেই ক্লান্ত শ্রান্ত রসুলাল্লাহকে অনুপ্রেরণা দিয়ে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন আম্মা খাদিজা (রা.)। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী মহানায়ককে অনুপ্রেরণা ও সাহস যুগিয়ে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করেছেন যে নারী তাঁর অবদানকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। ইয়ারমুকের যুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল বিস্ময়কর। রোমান বাহিনীর প্রচণ্ড ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে মুসলিম বাহিনীর পদাতিক ও অশ্বারোহীরা যখন ধীরে ধীরে পিছু হটে নিজেদের ক্যাম্পের কাছে চলে এসেছিলেন সেখানে তারা পেছন থেকে আক্রমণের শিকার হন। না, রোমান বাহিনী নয়, তাদেরকে পেছন থেকে তাঁবুর খুঁটি আর পাথর দিয়ে আক্রমণ করে বসে মুসলিম নারীরা। তারা সমস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, "যারা শত্রুর নিকট হতে পলায়ন করে তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ নাজেল হোক।" এবং তারা স্বামীদের প্রতি চিৎকার করে বলেন, "তোমরা যদি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারো তাহলে তোমরা আমাদের স্বামী নও।" সারিবদ্ধ অন্য নারীরা ড্রাম বাজিয়ে রণসঙ্গীত গাইতে থাকেন। নারীদের দ্বারা এভাবে অপমানিত হয়ে পুরুষ যোদ্ধারা পুনরায় ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নেন।

কিন্তু মেয়েরা কি সবসময় কেবল দ্বিতীয় লাইনেই থাকবেন? না। যুদ্ধে এমন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন মেয়েদেরকেও অস্ত্র হাতে নিতে হয়, সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে হয়। ওহুদের যুদ্ধে যখন মোসলেম বাহিনী বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, বহু সাহাবী শহীদ হয়ে যান, স্বয়ং রসুলাল্লাহ মারাত্মকভাবে আহত হন, কাফেররা প্রচার করে দেয় যে, রসুলাল্লাহও শহীদ হয়ে গেছেন এমনই বিপজ্জনক মুহূর্তে মেয়েরা আর দ্বিতীয় সারিতে থাকলেন না, তারা অস্ত্র হাতে নিয়ে রসুলাল্লাহকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কাফের সৈন্যদের বিরুদ্ধে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওহুদ যুদ্ধে নারী সাহাবী উম্মে আম্মারার (রা.) অবিশ্বাস্য বীরত্ব সম্পর্কে রসুলাল্লাহ বলেছিলেন, 'ওহুদের দিন ডানে-বামে যেদিকেই নজর দিয়েছি, উম্মে আম্মারাকেই লড়াই করতে দেখেছি।'

ইয়ারমুকের যুদ্ধে বীর যোদ্ধা দেরার বিন আজওয়ার যখন শত্রুর হাতে আটকা পড়েন তখন তারই বোন খাওলা ঘোড়ায় চড়ে এমন লড়াই শুরু করে ভাইকে উদ্ধার করেন যে স্বয়ং খালিদ (রা.) বিস্ময় প্রকাশ করেন। সত্যপ্রিয় পাঠকের বোঝার জন্য এ উদাহরণ দু'টিই যথেষ্ট যে, রসুলাল্লাহর সময়ে নারীরা প্রথম সারির ভূমিকাও কিভাবে পালন করেছেন। মাসলা মাসায়েলের জটিল জাল বিস্তার করে কোনো কাজেই তাদের অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করা হয় নি, আজ যেমনটা করা হচ্ছে। নারীর নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতাকে ইসলাম মোটেও অস্বীকার করে না। যদি অবস্থার প্রেক্ষাপটে কোন নারীকে দ্বিতীয় সারি থেকে প্রথম সারিতে আসতে হয় এবং সেখানে তিনি যদি তার জ্ঞান, প্রতিভা, যোগ্যতা, দক্ষতা, সামর্থ্যবলে নেতৃত্বদানের উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত হন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি বহু পুরুষের উপরও নেত্রী হিসাবে নিয়োজিত হতে পারবেন। উটের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন উম্মুল মো'মেনীন আয়েশা (রা.)। বহু সাহাবী তাঁর অধীনে থেকে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধটির বিভিন্ন দিক নিয়ে ঐতিহাসিকরা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, সমালোচনা করেছেন কিন্তু "ইসলামে নারী নেতৃত্ব হারাম" বলে তখন তাঁর পক্ষে বিপক্ষে যুদ্ধরত কোন সাহাবী ফতোয়া দিয়েছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আল্লাহর বিধান মতে কেবল একটি মাত্র পদ নারীকে দেওয়া বৈধ নয়, সেটি হলো- উম্মতে মোহাম্মদী নামক মহাজাতির এমামের পদ। আল্লাহ নারী ও পুরুষের দেহ ও আত্মার স্রষ্টা, সচেতন মন ও অবচেতন মনের স্রষ্টা। এদের উভয়ের দুর্বলতা সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানেন মহান আল্লাহ। তিনি জানেন যে নারীর শারীরিক গঠন যেমন পুরুষের তুলনায় কোমল, তার হৃদয়ও পুরুষের তুলনায় কোমল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল। সহজেই তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে, তার স্থৈর্য্য, দূরদর্শীতা পুরুষের চেয়ে কম, তাকে প্রভাবিত করা সহজতর। ইবলিস নারীকেই প্রথম আল্লাহর হুকুম থেকে বিচলিত

করেছিল। এ কারণেই আল্লাহর অসংখ্য নবী-রসুলের মধ্যে একজনও নারী নেই। পারস্যের সঙ্গে রোমের যুদ্ধের সময় রসুলাল্লাহ একটি পূর্বাভাসে বলেছিলেন, নারীর হাতে যে জাতি তার শাসনভার অর্পণ করেছে সে কখনো সফল হতে পারে না (তিরমিজি)। সুতরাং পৃথিবীময় উম্মতে মোহাম্মদী নামক যে মহাজাতি হবে সেই মহাজাতির এমাম কেবল নারী হতে পারবেন না, স্বীয় যোগ্যতাবলে অন্যান্য যে কোন পর্যায়ের আমীর বা নেতা সে হতে পারবে। শুধু নারী হওয়ার কারণে কেউ নেতৃত্ব দিতে পারবে না এটা ইসলামের দৃষ্টিতে যোগ্যতা অযোগ্যতার মাপকাঠি নয়।

পারিবারিক বিধানকে জাতীয়করণ করতে চায় বিকৃত ইসলামের আলেমরা

পুরুষ যেহেতু পরিবারের সবাইকে ভরন-পোষণ করাচ্ছে, লালন-পালন করছে কাজেই তার কথা পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে শুনতে হবে, এটা একটি পারিবারিক শৃঙ্খলা। কিন্তু পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলা সম্পর্কিত এই আয়াতটিকে সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বত্র প্রয়োগ করার চেষ্টা করছেন ধর্মজীবী আলেম সমাজ। তাদের এই অপচেষ্টার ফলে নারী সমাজের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকশিত হচ্ছে না, তারা তাদের যোগ্যতার প্রমাণও দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। আজকের বিকৃত ইসলামের কূপমণ্ডূক ধর্মজীবী আলেম-মোল্লারা সুরা নেসার ৩৪ নং আয়াত উল্লেখ করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের অধীন করে রাখার পক্ষে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। তারা এটা বুঝতে সক্ষম নন যে, একটি পরিবার পরিচালনার শৃঙ্খলা দিয়ে রাষ্ট্র চলতে পারে না, বা জীবনের অন্যান্য অঙ্গনগুলো চলতে পারে না। জীবনের অন্যান্য অঙ্গনে যার নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা বেশি সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক, তাকেই নেতা মনোনীত করা যাবে। সেখানে পারিবারিক জীবনের শৃঙ্খলাকে টেনে এনে অযোগ্য পুরুষকে নারীর কর্তা করতে হবে এমন সিদ্ধান্ত ইসলাম সমর্থন করে না। যেমন একটি প্রতিষ্ঠানে এক হাজার জন কর্মকর্তা, কর্মচারী আছে। সেখানে যদি জ্ঞান, যোগ্যতা, দক্ষতায় কোন নারী অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে সেখানে সেই নারীকে প্রধান অর্থাৎ নেতৃত্বদানকারী হিসাবে মেনে নিতে বাধা কোথায়? সেই হিসাবে একজন নারী কোন এলাকার রাজনৈতিক প্রশাসকও (Governor) হতে পারেন। আজকের বিকৃত ইসলামের ধ্বজাধারীরা ইসলামে পুরুষ ও নারীর অবস্থানকে এমনভাবে ভারসাম্যহীন করে ফেলেছে যে তারা নতমস্তক নারীদের গায়ে বোরকা চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের গৃহবন্দি করেছে, অপরদিকে পুরুষকে দিয়েছে স্বৈরশাসকের অধিকার। তথাকথিত প্রগতিশীলরাও মোল্লা শ্রেণির এইসব মুর্খতাকে অসার প্রমাণ করতে গিয়ে আল্লাহ-রসুলকেই দোষারোপ করছে। তারা নিজেরাও পাশ্চাত্য জড়বাদী 'সভ্যতা'র শিক্ষায় অন্ধ হয়ে আছেন। নইলে তারা বুঝতে পারতেন যে, এই ধর্মজীবী আলেম মোল্লারা আল্লাহ রসুলের ইসলামের কেউ নয়, বরং তাদের কাজের দ্বারা ইসলামে সীমাহীন ক্ষতি হয়েছে, এখনো হচ্ছে।

লেখক: হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র মেয়ে, দৈনিক বজ্রশক্তির উপদেষ্টা ও দৈনিক দেশেরপত্রের সাবেক সম্পাদক।

সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ বানানোর চেয়ে বড় ইবাদত হলো নিরন্নকে অন্ন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান

রাকীব আল হাসান

আল্লাহর রসুল এবং প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী খেজুর পাতার ছাউনি দেওয়া মাটির মসজিদ থেকে অর্ধ-পৃথিবী শাসন করেছেন, তাঁদের মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ছিল না। তবু যে ভূখণ্ডেই তখন এই জাতি শাসন করেছিল সেখান থেকে সমস্ত অন্যায়-অবিচার, যুদ্ধ-রক্তপাত, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, শোষণ-বঞ্চনা এক কথায় সর্ব প্রকার অন্যায় অশান্তি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অথচ বর্তমানে সারা দুনিয়াতে এমন বহু মসজিদ রয়েছে যার গম্বুজ সোনার তৈরি। মসজিদগুলোর ভেতর, বাহির এতটাই জাঁকজমকপূর্ণ যে তা রাজপ্রসাদকেও হার মানায়। কিন্তু সমাজ অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাতে পরিপূর্ণ। আল্লাহর রসুল বর্তমানের এই সময়ের অবস্থাকেই বর্ণনা করে বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন- (১) ইসলাম শুধু নাম থাকবে, (২) কোর'আন শুধু অক্ষর থাকবে, (৩) মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও লোকে লোকারণ্য হবে কিন্তু সেখানে হেদায়াহ থাকবে না, (৪) আমার উম্মাহর আলেমরা হবে আসমানের নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব, (৫) তাদের তৈরি ফেতনা তাদের ওপর পতিত হবে। [আলী (রা:) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]

আল্লাহর রসুলের পবিত্র মুখনিঃসৃত এই বাণীটি আজ অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। জাঁকজমকপূর্ণ একেকটা মসজিদ নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয় তা দিয়ে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষের আহার জুটতে পারে, দীন দরিদ্র্যের জীবনকে স্বচ্ছল করা যেতে পারে। আমাদের দেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের অলিতে গলিতে রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ। শুধু মসজিদ নয় মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোও যে বিপুল অর্থব্যয়ে তৈরি হয় তাও মসজিদগুলোর মতোই। এই ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ, সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণসহ সেখানকার ধর্মগুরুদের পেছনে যে পরিমাণ অর্থ সাধারণ মানুষ ব্যয় করে থাকে তা যে কোনো সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত অর্থের বহুগুণ। অথচ ঐ উপাসনালয়গুলোতে শুধুমাত্র উপাসনা ভিন্ন অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজই হয় না। দিনের বেশিরভাগ সময় সেগুলো তালাবদ্ধ থাকে।

ভিন্ন দৃষ্টি

তবে কি স্রষ্টা আমাদের কাছে শুধুই উপাসনার কাঙাল? স্রষ্টা কি শুধুই উপাসনালয়ের মধ্যে থাকেন? মানুষের সকল কল্যাণ কি শুধু উপাসনার মধ্যেই নিহিত? সকল ধর্মের উদ্দেশ্যই কি মানুষকে উপাসনায় ব্যস্ত রাখা?

না, ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, মানবতার কল্যাণ করা। কিন্তু সকল ধর্মের মানুষই আজ মানবতার কল্যাণের পথ ছেড়ে শুধু উপাসনালয়ে পড়ে থাকাকেই ধর্ম জ্ঞান করছে, ইবাদত মনে করছে। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে তার ইবাদত করা ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেন নি (সুরা যারিয়াত ৫৬) সেহেতু আমাদেরকে জানতে হবে ইবাদত কাকে বলে। নামাজ রোজা করা, পূজা-অর্চনা, জপমালা জপা, ধ্যানমগ্ন হয়ে সময় ব্যয় করা ইত্যাদি মানুষের প্রকৃত ইবাদত নয়। ইবাদত কথাটির অর্থ হচ্ছে যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজ করা। একটি ঘড়ি তৈরি করা হয়েছে সময় দেখানোর জন্য, এটা করাই তার ইবাদত। সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে আলো ও তাপ দেওয়ার জন্য, এটা করাই তার ইবাদত।

মানুষকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা আগে জানতে হবে। কারণ সেটা করাই তার ইবাদত। মানুষকে কি মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জা, প্যাগোডায় গিয়ে বসে থাকার

জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? না। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি (Representative) হিসাবে (সুরা বাকারা-৩০)। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ যেভাবে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ রেখেছেন ঠিক সেভাবে এ পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখাই মানুষের এবাদত। ধরুন আপনি গভীর রাত্রে প্রার্থনায় মগ্ন। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে 'আগুন আগুন' বলে আর্তচিৎকার ভেসে এল। আপনি কী করবেন? দৌড়ে যাবেন সাহায্য করতে নাকি চোখ-কান বন্ধ করে প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন। যদি আগুন নেভাতে যান সেটাই হবে আপনার এবাদত। আর যদি ভাবেন- বিপন্ন ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোক, তাহলে আপনার মধ্যে মানুষের ধর্ম নেই, আপনার নামায-রোযা, প্রার্থনা সবই পণ্ডশ্রম।

আল্লাহ মুসা (আ.) কে বলছেন, 'আমিই আল্লাহ, আমি ব্যতীত কোন এলাহ (হুকুমদাতা) নেই, অতএব আমার এবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাহ কায়েম কর (সুরা ত্বা-হাঃ ১৪)। এমনই আরো অনেক আয়াত থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে এবাদত ও সালাহ আলাদা বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এবাদত হচ্ছে আল্লাহ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব। মুসার (আ.) দায়িত্ব অর্থাৎ এবাদত কী ছিল তা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'ফেরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে (সুরা ত্বা-হাঃ ২৪)। আল্লাহ তাঁকে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ইহুদি জাতিকে দাসত্বের কবল থেকে মুক্ত করে তাদের মানবাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, মানবতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

পৃথিবী অশান্তির জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে, মানুষের মুখে ভাত নেই, উপাসনালয় থেকে জুতা পর্যন্ত চুরি হয়, চার বছরের শিশু কন্যা পর্যন্ত ধর্ষিত হয়, পৃথিবীর মাটি মানুষের রক্তে ভিজে আছে, অথচ এক শ্রেণির লোক মসজিদে গিয়ে যিকির আজকার করেন আর মনে করেন ইবাদত করছেন, মন্দিরে গিয়ে দুধ-কলা দিয়ে মনে করেন যে উপাসনা হচ্ছে, মক্কায়-কাশিতে গিয়ে মনে করেন যে, তারা নিষ্পাপ হয়ে গেছেন। ধর্মগুরুদেরকে অর্থদান করে ভাবেন মহাপুণ্যের কাজ করছেন, আসলে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে আছেন। তাদের ইবাদত করা হচ্ছে না। মানুষের প্রকৃত ইবাদত হলো মানবতার কল্যাণে কাজ করা। আল্লাহ বলেছেন, "পূর্ব এবং পশ্চিমদিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পুণ্য নেই। কিন্তু পুণ্য আছে কেউ আল্লাহর উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, মালায়েকদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসুলগণের উপর ঈমান আনবে, আর আল্লাহরই প্রেমে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও দাসমুক্তির জন্যে। আর যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণকারী তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই মুত্তাকী (সুরা বাকারা ১৭৭)।

সুতরাং মানুষ কী করলে শান্তিতে থাকবে, দরজা খুলে ঘুমাবে, নির্ভয়ে পথ চলতে পারবে, সেই লক্ষ্যে কাজ করাই হলো ইবাদত। এটা সকল ধর্মের মানুষের জন্যই কর্তব্য। এই অর্থে যারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার দায়িত্বে আছেন তারা যদি কোনো দুর্নীতি না করে ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে অবস্থান করেন, মানুষকে শান্তি দেওয়ার কাজ করেন তবে তারাই স্রষ্টার অধিক নিকটবর্তী হবেন। যারা মানবতার কল্যাণে এই কাজগুলো করবে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করবে তাদের প্রশিক্ষণের জন্য, তাদের চরিত্র সৃষ্টি করার জন্য দরকার হলো নামাজ, রোজা, হজ্বসহ অন্যান্য ধর্মের উপাসনাগুলো। যেমন একটি বাড়িতে খুঁটি দেওয়া হয় ছাদকে ধরে রাখার জন্য। যদি ছাদই না দেওয়া হয়, তাহলে শুধু খুঁটি গেঁড়ে কোনো লাভ নেই। উপাসনাগুলি হচ্ছে এই খুঁটির মতো। তেমনি যারা শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করবে না, তাদের জন্য এই উপাসনাগুলো কোনো কাজে আসবে না। এগুলো তাদেরকে স্বর্গে বা জান্নাতে, হ্যাভেনে নিতে পারবে না। আমাদেরকে বুঝতে হবে, স্রষ্টা শুধু মসজিদে মন্দিরে থাকেন না। তিনি হাদিসে কুদসীতে বলেছেন, 'আমি ভগ্ন-প্রাণ ব্যক্তিদের সন্নিকটে অবস্থান করি।' অন্যত্র বলেছেন, 'বিপদগ্রস্তদেরকে আমার আরশের নিকটবর্তী করে দাও। কারণ আমি তাদেরকে ভালোবাসি।' (দায়লামী ও গাজ্জালী)।

রসুলাল্লাহ (সা.) সমগ্র জীবন ধরে যে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন তা কিসের জন্য? এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য। সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, দুঃখ, দারিদ্র্য, সকল প্রকার বিভেদ দূর করে ঐক্য, শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং যাবার আগে এই শান্তি ও ঐক্য সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন তার হাতে গড়া জাতিটির উপর। ইসলাম প্রতিষ্ঠা মানেই শান্তি প্রতিষ্ঠা। গৌতম বুদ্ধ (আ.) বুদ্ধত্ব অর্থাৎ নবুয়ত লাভ করার পর শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, "হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখ ও মঙ্গলের জন্য এমন ধর্ম প্রচার করো, যে ধর্মের আদি, মধ্য এবং অন্তে কল্যাণ।" সুতরাং বোঝা গেল, ধ্যান করে দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ নয়, মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণই ছিল বুদ্ধের (আ.) প্রচারিত ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য। একইভাবে ঈসা (আ.) ইহুদিদের প্রার্থনার দিন শনিবারে শরিয়াতের বিধান লঙ্ঘন করে অন্ধ, রুগ্ন, খঞ্জকে সুস্থ করে তুলেছেন। (নিউ টেস্টামেন্টঃ মার্ক ৩, লুক ১৪)। সাবাথের দিনে তিনি কেন মানুষের এই কল্যাণগুলো করলেন, ধর্মজীবী রাব্বাই সাদ্দুসাইদের দৃষ্টিতে এটাই ছিল যিশুর মহাপাপ। তাই তারা তাঁকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষসহ রাষ্ট্রশক্তিকে উসকে দিয়ে তাঁকে একেবারে হত্যা করে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছে। এভাবেই সকল নবী ও রসুল তাদের জীবন ও কর্ম দিয়ে মানুষের কষ্ট দূর করাকেই ধর্ম বলে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। মানুষের শান্তিই সকল ধর্মের আত্মা। ওঙ্কার ধ্বনির অর্থ শান্তি, ইসলাম শব্দের অর্থও শান্তি, আবার বৌদ্ধ ধর্মেরও মূল লক্ষ্য "সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্ত- জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।" যে ধর্ম মানুষকে শান্তি দিতে পারে না, সেটা আত্মাহীন ধর্মের লাশ। প্রদীপের শিখা নিভে গেলে সেটা আর আলো দিতে পারে না, দিতে পারে শুধু কালি। তাই আজ সারা বিশ্বে যে ধর্মগুলো চালু আছে সেগুলোর বিকৃত অনুসারীরা মানুষকে আলোকিত করার বদলে কালিমালিপ্ত করছে, শান্তির বদলে বিস্তার করছে সন্ত্রাস। তারা ভুলেই গেছে ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?

ধর্মকে মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদিতে ঢুকিয়েছে স্বার্থান্বেষী একশ্রেণির ধর্মজীবীর দল। এই

পরাশ্রয়ী ধর্মজীবী শ্রেণিটি সকল ধর্মেই বিদ্যমান। এরা ধর্মকে বানিয়েছে তাদের বাণিজ্যের মূলধন, পুঁজি। নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে করেছে বিকৃত। এদের সামনে যত অধর্মই হোক, যত অন্যায়, অবিচার হোক এরা কোনো প্রতিবাদ না করে মাথা নিচু করে মসজিদে, মন্দিরে, প্যাগোডায়, গীর্জায় গিয়ে ঢুকবে। এদের গায়ে যেন ফুলের টোকাও না পড়ে এ জন্য এরা উপাসনালয়ে ঢুকে নিরাপদ ইবাদতে মশগুল থাকে। মানবতার কল্যাণ, মানবজাতির শান্তি নিয়ে এদের কোনো চিন্তা নেই, যত বেশি মানুষ নামাজ পড়বে, যত বেশি মানুষ পূজা করবে ততই এদের লাভ। দানবাক্স ভর্তি হবে, তাদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে। এজন্যই তারা নির্যাতিত মানুষের শান্তি-অশান্তির দায়িত্ব শয়তান, অত্যাচারী দুর্বৃত্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে মসজিদে, মন্দিরে, গীর্জায়, প্যাগোডায় ঢুকেছেন। তারা ধর্মকে বাস্তবজীবন থেকে অপসারণ করে উপাসনা, পূজা-প্রার্থনার বস্তুতে পরিণত করেছেন।

ধর্ম ছাড়া মানুষের মুক্তি নেই, কিন্তু আত্মাহীন ধর্মও মানুষকে মুক্তি দিতে অক্ষম। কাজেই এখন মানবতার কল্যাণের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ধর্মকে চার দেয়ালের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সোনার গম্বুজওয়ালা মসজিদ, জাঁকজমকপূর্ণ গীর্জা, প্যাগোডা, আলিশান মন্দির নির্মাণের চেয়ে মানবতার কল্যাণ করা এখন জরুরি। নিরন্নকে অন্নদান, নির্বসনকে বস্ত্রদান, অসহায়, দরিদ্রকে সাহায্য করা এবং সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত ইত্যাদি বন্ধ করাই আসল ইবাদত।

শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয় কেন?

এস.এম.সামসুল হুদা

বিকৃত ধর্মবিশ্বাস যে বৃহৎ সমস্যাগুলো সৃষ্টি করে তার মধ্যে অন্যতম হলো জঙ্গিবাদ। বর্তমান পরিস্থিতিতে জঙ্গিবাদ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি বিরাট সঙ্কট। আমাদের দেশও এই সঙ্কটে আক্রান্ত। বরাবরই আমাদের দেশে জঙ্গিবাদকে মোকাবেলা করার জন্য শক্তি প্রয়োগের পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার প্রেক্ষিতে শক্তি প্রয়োগের অসারতা ক্রমেই প্রকাশ হয়ে পড়ছে। আমরা বলি না যে শক্তি প্রয়োগের দরকার নেই, প্রয়োজন হলে অবশ্যই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু এটা মূল প্রক্রিয়া নয়। শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে এই সঙ্কট মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

জঙ্গিদের যতই হত্যা করা হচ্ছে, তাদের তৎপরতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ বিকৃত হলেও তাদের জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে একটি ধর্মীয় আদর্শ।

আমেরিকা আপস করতে বাধ্য হয়েছে!

এটা কারও অজানা নয় যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো সুপার পাওয়ার ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে, অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র ব্যবহার করে, লক্ষ লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী কাজে লাগিয়েও জঙ্গিবাদীদের নির্মূল করতে পারে নি। তাদের এই পথ সফল হয় নি। তারা প্রচুর রক্তক্ষয় করেছে কিন্তু জঙ্গিবাদের প্রকোপ আরও বেড়ে গেছে। আজকে তারা জঙ্গিদের সাথে আপসের রাস্তা বেছে নিয়েছে। কাজেই আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশে একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সফলতার আশা করা যায় না।

একজন জঙ্গি মরলে দশজন সৃষ্টি হয়

কর্তৃপক্ষকে বুঝতে হবে, তারা জঙ্গি হচ্ছে একটি বিকৃত ধর্মীয় আদর্শের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে। এক

শ্রেণির স্বার্থবাজ ধর্মব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাদেরকে সেই ভ্রান্ত আদর্শ শিক্ষা দিচ্ছে। তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে এটা জেহাদ, এটা করলে তুমি জান্নাতে যাবে, এই কাজে নিহত হলে তুমি শহীদ হবে। এভাবেই ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে, প্রভাবিত হয়ে মানুষ জঙ্গি হচ্ছে, সহিংসতার পথ বেছে নিচ্ছে। তাই দেখা যাচ্ছে- শক্তি প্রয়োগ করে একজনকে নির্মূল করতে গেলে আরও দশজন সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, তারা আরও সতর্ক, নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করছে, কোন কিছুতেই তাদের উত্থান ঠেকানো যাচ্ছে না।

জঙ্গিরা দুনিয়া আখেরাত দু'টোই হারাবে

যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কোর'আন-হাদীস, ইতিহাস থেকে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যারা জঙ্গি হচ্ছে তারা ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে। এই পথে তারা দুনিয়াও হারাবে, আখেরাতও হারাবে। তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এদেশের অধিকাংশ লোক বিশ্বাসগতভাবে মুসলমান। তারা বিশ্বাস করে আল্লাহ-রসুলকে। তারা ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের কথায় প্রভাবিত হয়। ধর্মব্যবসায়ীদেরকে যদি শুধুমাত্র বল প্রয়োগে দমনের চেষ্টা করা হয় তখন তাদের অনুসারীরাই জঙ্গিতে রূপান্তরিত হয়। এখন অধিকাংশ জনগণকে যদি ইসলামের যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এটা বোঝানো যায়, তাদের এই পথ ভুল, এই পথে তারা দুনিয়াও হারাচ্ছে এবং আখেরাতও হারাবে তাহলে আর ধর্মব্যবসায়ীরা কাউকে জঙ্গিতে রূপান্তরিত করতে পারবে না।

বলপ্রয়োগ কখন?

কোর'আন, হাদীস থেকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর পরও অপরাধী চরিত্রের ক্রিমিনাল মাইন্ডেড কিছু মানুষ থাকবে, তারা সংখ্যায় হবে অল্প, তখন তাদেরকে নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন। তখন দরকার পড়বে বল প্রয়োগের। প্রকৃত সত্য যখন মানুষ জানতে পারবে, ধর্মজীবীদের করা অপব্যখ্যা যখন তারা বুঝতে সক্ষম হবে তখন আর জঙ্গিবাদীরা, অপরাজনীতিকারীরা মানুষকে প্রভাবিত করার মতো ধর্মীয় যুক্তি খুঁজে পাবে না। তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদেরকে সহজেই নির্মূল করা সম্ভব হবে, এতে অধিকাংশ জনগণ আর বিক্ষুব্ধ হবে না। এই অধিকাংশ জনগণকে ধর্মব্যবসায়ীদের থেকে যতক্ষণ না বিচ্ছিন্ন করা যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই শক্তি প্রয়োগের পন্থা কার্যকরী হবে না।

আমাদের চ্যালেঞ্জ

আমরা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি প্রকৃত ইসলাম কী তা মানুষ বুঝতে পারলে এনশা'আল্লাহ কেউ আর জঙ্গি হবে না। তারা সত্যের পথে আত্মনিয়োগ করবে, তারা সম্পদ বিক্রি করে এসে মানবতার কল্যাণে কাজ করবে, মানবতার ক্ষতি করবে না। গত ১৯ বছর যামানার এমামের একজন অনুসারীও একটি সামাজিক অন্যায় পর্যন্ত করে নি, কোনো একটি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর উপর আক্রমণের নজির নেই। আমাদের বিরুদ্ধে হাজারো অপপ্রচার করা হয়েছে। আমরা যে আদর্শ প্রচারের কাজ করছি, প্রকৃত ইসলাম মানুষের সামনে তুলে ধরছি সেটা এমামুয্যামানের শিক্ষার প্রতিফলন।

ধর্মজীবীরা জঙ্গিবাদ মোকাবেলার উপযুক্ত নয়

তবে হ্যাঁ, আপনারা অতীতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কোর'আন-হাদীস দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন নি, তা নয়। অবশ্যই করেছেন। কিন্তু এই কাজ করেছেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের দিয়ে। অথচ এরাও ধর্মব্যবসায়ী। জঙ্গিবাদ যেমন অবৈধ তেমনি ধর্মব্যবসাও অবৈধ, বিকৃত ইসলামের দু'টি শাখা- জঙ্গিবাদ ও ধর্মব্যবসা। ধর্মব্যবসায়ীদের কোন নৈতিক বল থাকে না, আর যাদের নৈতিক চরিত্র সবল নয়, তাদের পক্ষে এই মহান কাজ করা সম্ভব নয়। তাদের কথা কেউ শুনবে না, জনগণের মধ্যে তাদের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কথা বললে, ওয়াজ করলে মানুষ বিশ্বাস করবে না। মনে রাখতে হবে, একটি মিথ্যা দিয়ে কোনদিন আরেকটি মিথ্যাকে প্রতিহত করা যায় না। আমরা যামানার এমামের অনুসারীরা ধর্মব্যবসা করি না এবং সত্য পথে আছি। কাজেই সমাধান একমাত্র আমাদের হাতেই রয়েছে।

মাননীয় এমামুয্যামানের লেখা থেকে সম্পাদিত

বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উৎস ও ফলাফল

কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা যখন সামরিক শক্তিবলে মুসলিম ভূখণ্ড পদানত করে এবং এই মুসলিম নামধারী জনসংখ্যাকে পদানত গোলামে পরিণত করে তখনও এ জাতির অনেকের মধ্যেই ইসলামের চেতনা, আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য ও মুসলিম হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি কিছু হলেও অবশিষ্ট ছিল, তাদের উপর আল্লাহ ও রসুলের হুকুম কী, এ ব্যাপারে তারা সচেতন ছিলেন অর্থাৎ আগুনের শিখা না থাকলেও ঈমানের উত্তপ্ত কয়লা তখনও গনগন করছিল। এ কারণে খ্রিষ্টানরা ক্ষমতা লাভ করলেও তাদের কর্তৃত্ব নিষ্কণ্টক ছিল না। বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনচেতা মুসলিমদের বিদ্রোহ লেগেই ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তার পুত্র দুদু মিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন, নুরুদ্দিন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গের ফকীর সন্ন্যাসী আন্দোলন, ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ঘটনাগুলি ব্রিটিশ শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিতে ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে দারুল হারব (যুদ্ধক্ষেত্র) ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। হাজার হাজার মুসলিম এসব আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং বহু সংখ্যক জীবন উৎসর্গও করে গেছেন।

এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসাবে খ্রিষ্টানরা যে কয়টি শয়তানী চক্রান্ত করল তার একটি হচ্ছে মুসলিমদেরকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বহীন, সম্পূর্ণরূপে সংগ্রাম বিমুখ, ভীরু, কাপুরুষ এবং খ্রিষ্টান শাসকদের অনুগত নির্বীর্য চরিত্রের মানুষে পরিণত করার জন্য বিকৃত ইসলাম তৈরি করে মাদ্রাসার মাধ্যমে এ জাতির চরিত্রে, আত্মায় গেঁড়ে দেওয়া। (কেরামত আলী জৈনপুরী রচিত মুকাশাফাত-ই-রাহমা গ্রন্থে ১৩ পৃ:)। তারা অনেক গবেষণা করে একটি বিকৃত ইসলাম তৈরি করল যাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দেওয়া হলো এবং ব্যক্তিগত জীবনের মাসলা মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া কালাম, মিলাদের উর্দু ফার্সি পদ্য বিশেষ করে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই বহু মতবিরোধ সঞ্চিত ছিল সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করল। এই আত্মাহীন মৃত ইসলামটিকে জাতির মনে মগজে গেঁড়ে দেওয়ার জন্য এই উপমহাদেশের ভাইসরয় (**Viceroy**) বা বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। সেখানে নিজেদের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ থেকে **১৯২৭ সন পর্যন্ত** ১৪৬ বছর ধরে মুসলিম জাতিকে সেই বিকৃত ইসলাম শেখালো। এই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি করে রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পথ না থাকে। খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রি করে উপার্জন করতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত ইসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। খ্রিষ্টানরা তাদের এই পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ করল। তাদের এই মাদ্রাসা প্রকল্পের মাধ্যমে দীনব্যবসা ব্যাপক বিস্তার লাভ করল এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, আচার্য, খ্রিষ্টানদের পাদ্রী, ইহুদিদের রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফরিশি, বৌদ্ধদের শ্রমণ, ভিক্ষুদের মতো একটি স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করল। **এই শ্রেণিটি জাতির সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করল তা হচ্ছে- ধর্মের মূল শিক্ষা, প্রধান লক্ষ্যই যে মানবতার কল্যাণ এই দিকটাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে ধর্মকে কেবল ব্যক্তিজীবনের কিছু উপাসনার মধ্যে বেঁধে ফেলল এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করল। ফলে ধর্মের দ্বারা আর মানবতার কল্যাণ হলো না।**

যাই হোক, দীর্ঘ ১৪৬ বছর (১৭৮০ সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ৭০ বছর মুসলিম নামধারী মোল্লাদেরকে অধ্যক্ষ পদে রেখে এবং ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৬ বছর খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা নিজেরা সরাসরি অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে) এ বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দেবার পর ব্রিটিশরা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের তৈরি করা বিকৃত ইসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হতে পারবে না, তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মাওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিল (আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আ. সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, **Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal" by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)**, মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)। তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার Syllabus ও Curricullum শুধু ঐ মাদ্রাসায় সীমিত না রেখে ব্রিটিশ শাসকরা তা বাধ্যতামূলকভাবে এই উপমহাদেশের সর্বত্র বেশির ভাগ মাদ্রাসায় চালু করল। উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হবার পর ঐ আলীয়া মাদ্রাসা উভয় পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও খ্রিষ্টানদের তৈরি বিকৃত ইসলামের সেই পাঠ্যক্রমই চালু থাকে; শুধু ইদানীং এতে কিছু বিষয় যোগ করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিত দাখেল, ফাযেল ও আলেমরা দীন বিক্রি করে খাওয়া ছাড়াও ইচ্ছা হলে অন্য একটা কিছু করে খেতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম বলে পরিচিত পৃথিবীর জনসংখ্যাটি যাতে কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের তৈরি যে প্রাণহীন, আত্মাহীন বিকৃত ইসলামটা ১৪৬ বৎসর ধরে শিক্ষা দিয়েছিল সেই বিকৃত, আত্মাহীন ইসলামটাকেই প্রকৃত ইসলাম মনে করে আমরা প্রাণপণে তা আমাদের জীবনে কার্যকরী করার চেষ্টায় আছি।

ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লাদের কাছে থাকা ইসলামটি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, বরং এটা ব্রিটিশদের শেখানো বিকৃত ও বিপরীতমুখী ইসলাম। প্রকৃত ইসলামটি মুসলিম জাতিকে সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্বকারী শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিল আর বর্তমানের বিকৃত ইসলামটি মুসলিমদের নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, সর্বনিকৃষ্ট দাসজাতিতে পরিণত করেছে; সুতরাং সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় দুটি এক জিনিস নয়। একটা কথা আছে- ফলেন পরিচয়তে।

ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার উত্তরাধিকার

রিয়াদুল হাসান

মানবজাতির ইতিহাসে ধর্মের অধ্যায়টি বিরাট। এ বিরাট অধ্যায়ের দিকে তাকানোর জন্য আমাদের সামনে এখন দুটো চশমা রয়েছে। একটি ধর্মহীন চশমা, আরেকটি ধর্মের চশমা। এ দুটো চশমায় আমাদের অতীত দুটি ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে ধরা পড়ে।

ধর্মহীন চশমা বলছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে, এর কোনো স্রষ্টা নেই। সকল জীব ও জড়ও এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণিকূলের মধ্যে কেউ উন্নত, কেউ অনুন্নত যা নির্ণীত হয়েছে তাদের অভিযোজনের ক্ষমতার তারতম্য দ্বারা। মানুষ (খুব সম্ভবত) একটি বানরজাতীয় বিবর্তিত প্রাণী, যার আদিপিতা-পিতৃব্যরা গাছে থাকত, তাদের লেজ ছিল। খুলির আকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী তারা নিগ্রয়েড, ককেশয়েড, মঙ্গলয়েড, অস্ট্রালয়েড ইত্যাদি শ্রেণিবিন্যাসে বিভক্ত।

আর ধর্মের চশমা বলছে, এই বিশ্বজগৎ নিজে থেকে সৃষ্টি হয় নি, এর একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি নিরন্তর এটি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন করছেন। তিনি বিশ্বজগতে এমন কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম, ব্যবস্থা বা চক্র আরোপ করেছেন যার দ্বারা সকল বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টি, পালন, বাস্তুসংস্থান, ধ্বংস ইত্যাদি সাধিত হয়। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী এক সৃষ্টি যার উদ্ভব জান্নাতে, যার আদিপিতা আদম (আ.), আদিমাতা হাওয়া (আ.)। তাদের থেকেই আজকের সকল হিন্দু, সকল বৌদ্ধ, সকল মুসলিম, সকল খ্রিষ্টান, আর সকলেই।

একটি চশমা দিয়ে তাকালে দেখি নূহ (আ.), ইব্রাহীম (আ.), মুসা (আ.), ঈসা (আ.) ইত্যাদি বহু উজ্জ্বল নাম। অন্য চশমায় তাদেরকে দেখা যায় না, সেখানে আছে বস্তুবাদী দার্শনিক আর বিভিন্ন রাজবংশের নাম। একটি চশমা বলছে, মানব ইতিহাস নবী-রসুলদের মাধ্যমে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামের ইতিহাস, ধর্মের দ্বারা মানবজাতির শান্তি পাওয়ার ইতিহাস। অন্য চশমাটি বলছে মানুষের অতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল ধর্ম নামক কুসংস্কার ও বর্বরতা দ্বারা। বর্তমানে ধর্ম বিদায় নিয়েছে, মানুষ অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে।

বর্তমানে আমরা জাতি হিসাবে দ্বিধাগ্রস্ত, ধর্ম ও আধুনিকতা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে দণ্ডায়মান, দু'নৌকায় পা দিয়ে আছি আমরা। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি উজ্জ্বল আকর্ষণ নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে, ধর্ম ক্রমেই বিবর্ণ ও আকর্ষণহীন বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্তের কণিকায় মিশে আছে যা বাদ দেওয়া সহজ নয়। তবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির

যে প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীগুলোতে চালানো হয়েছে তা খুবই সফল হয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উপরে যে দুটো চশমার কথা বললাম, বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা, বিশেষ করে মুসলিম নামধারীরা এ দুটো চশমা দিয়েই নিজেদের ইতিহাসকে দেখতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। এর প্রভাব পড়ছে তাদের ব্যক্তি থেকে জাতীয় জীবনের সর্বত্র।

এ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে রাখা হয়েছে নামে মাত্র। এস.এস.সি পর্যন্ত ধর্মের যেটুকু রাখা হয়েছে সেটুকুর উদ্দেশ্য নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান। কারণ এটা অস্বীকার করার মত অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয় নি যে, সকল ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সত্যনিষ্ঠা ধর্মেরই অবদান। ধর্ম বইতে বলা হচ্ছে সমস্ত কিছুর মালিক স্রষ্টা, অথচ অন্য সকল বইয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, এমনভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বে অস্বীকার করা হয়েছে। আর ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। যে ধর্ম সেখানে শেখানো হচ্ছে সেটাও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই আলোচনা করে, সামষ্টিক জীবন কীভাবে চলবে তা শেখানোর জন্য আছে অন্যান্য বিষয়সমূহ। এটা হচ্ছে মানবজাতিকে ধর্মবিমুখ করে তোলার একটি সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। কিন্তু পাশ্চাত্যে নানা কারণে এ প্রক্রিয়া কিছুটা সফল হলেও প্রাচ্যে এটি কয়েক শতাব্দী পরও খাপ খাচ্ছে না। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে একটু গভীরে যেতে হবে।

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' দর্শনটি উনিশ শতকে যুক্তরাজ্য

জ্যাকব হোলিওক (George Jacob Holyoake) নামক এক ব্যক্তি সেকুলারিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। Oxford Dictionary-তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc. অর্থাৎ সমাজ কাঠামোতে ধর্মকে সম্পৃক্ত করা যাবে না এমন বিশ্বাস পোষণ করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ মতবাদের অনুসারী (Secular) সম্পর্কে বলা হয়েছে, Not connected with spiritual or religious matter. যিনি আধ্যাত্মিক বিষয় বা ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নন।

মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির চর্চার নামে Enlightenment Movement-এর ফসল হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর উদ্ভব হয়েছে। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের মাধ্যমে এর অনুসারীরা মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন দর্শন আমদানি করলেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই; ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অন্তরের ব্যাপার; অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতি থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, যুক্তি (logic)-ই জীবন পরিচালনার ভিত্তি হবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনার (divine guidance) কোনো প্রয়োজন নেই। ইউরোপে এই আন্দোলনের সফলতার ফলে ধর্মহীন যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠল, তাতে মানুষ নিতান্তই স্বার্থপর হয়ে গেল, ভোগবাদী হয়ে পড়ল, পূর্বপুরুষ ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। সর্বোপরি নীতিবোধের লোপ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ই এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে প্রকাশ পেল।

মূলত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ব্যতীত একটি কল্যাণকর মানবসমাজ কল্পনা করা যায় না। আর নৈতিক শিক্ষার মূল বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উৎসারিত। মানবসমাজে বিরাজিত সকল নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তথা সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ব্যক্তিমানুষকে তাঁর আদেশ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, পৃথিবীতে ও পরলোকে কু-কর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে উৎসাহ দেয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসের কারণেই ব্যক্তি সবচেয়ে গোপন ও নিরাপদ জায়গাতেও শত প্রলোভন সত্ত্বেও অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত হতে পারে না। কিন্তু এ বিশ্বাসের বীজ যার হৃদয়ে বপিত হয় নি তার কাছে নৈতিকতা অর্থহীন মনে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা ভঙ্গুর ও বিক্ষিপ্ত। এমন কি এগুলোর আদি উৎসও বিভিন্ন ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে যে নৈতিক শিক্ষার কথা বলা হয় তাতে ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে তার দায়বদ্ধতার কারণে নীতি মেনে চলে। ফলে ব্যক্তি যেকোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলোভনে পড়ে কিংবা মানবিক দুর্বলতার কারণে তার নৈতিক গণ্ডির বাইরে চলে যেতে পারে। সে তো পরকালীন শাস্তির ভয়ে নীতি মানছে না, তাই একবার ভাঙলে আবার তা গড়ে তোলার শক্তিশালী অনুপ্রেরণা পায় না। সে ভাবে যে, নশ্বর এই পৃথিবীতে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন কেটে গেলেই হলো।

সুতরাং ধর্মকে কাজে লাগিয়েই সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করা সম্ভব, অন্যভাবে নয়। তাই শিশুকাল থেকেই এ চরিত্রগঠনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। আমরা জানি যে, ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপযুক্ত সময় তার শৈশব ও কৈশোর। এ সময় শিশুকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হবে তার গন্তব্যও সেদিকেই হবে। আমরা সবাই চাই, আমাদের শিশুরা জ্ঞানে-গুণে, যোগ্যতা-দক্ষতায় অনন্য হোক এবং তাদের সেই জ্ঞান ও দক্ষতা কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হোক। অথচ তাদেরকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সকল নৈতিকতার উৎস ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার শিক্ষাই দিয়ে থাকি। আমরা কি দেখছি না যে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই আজ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, চরিত্র বিকিয়ে টাকার মালিক হওয়ার প্রতিযোগিতা, মিথ্যা আর জালিয়াতির ছড়াছড়ি। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য যেমন মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সেই মানুষগুলোকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা। বিকৃত ধর্ম সমাজকে আরো দূষিত করবে। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা যেমন পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে দিতে হবে তেমনি দিতে হবে রাষ্ট্রের উদ্যোগের মাধ্যমে। রাষ্ট্রই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন করে। আর সকল পরিবারের পক্ষে সমভাবে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক কাঠামোয় তৈরি করা সম্ভব নয়। পরিবারের অজ্ঞতা বা অসচেতনতার কারণে যেন শিশু সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য সমগ্র জাতিকে এ ভার নিতে হবে। নীতিহীন, চরিত্রহীন মানুষ একটি দানব ছাড়া আর কিছু নয়, বিশেষ করে যখন সে কোনো ধ্বংসাত্মক শক্তির অধিকারী হয়ে যায়। এটা উপলব্ধি করে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর The Philosophy of the Modern Education গ্রন্থে অধ্যাপক বার্বাস বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষ ধ্বংসের উপকরণ অনেক বেশি জোগাড় করে ফেলেছে।"

জাতিকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে

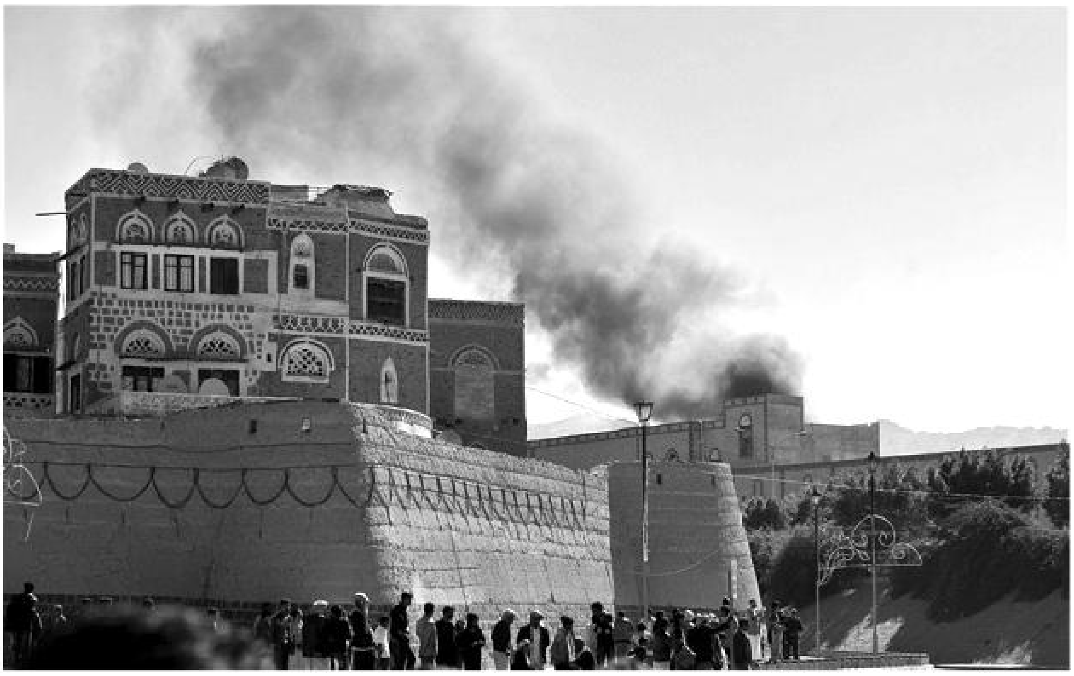

আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ আসাদ আলী

“আমরা কেউই আসলে ভাবতে পারিনি এ সংকট আমাদের আজকের পরিস্থিতিতে নিয়ে আসবে। শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনে সরকারের কঠোর পদক্ষেপই একে সহিংস লড়াইয়ে পরিণত করে। এর পরিণতি আজ ভয়ংকর হয়ে দেখা দিয়েছে। এখান থেকে উত্তরণে কোনো আশার আলো আর নেই।” সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধের ৫ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে দেশটির ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে এভাবেই অভিমত ব্যক্ত করেন সিরীয় শিক্ষাবিদ ও বিশ্লেষক মারওয়ান কাবালান। দেশটির ভয়াবহতার চিত্র এককথায় হৃদয়বিদারক। প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকার লড়াই সেখানে। একেকটি দিন পার হওয়া মানেই একেকটি নতুন জীবন। সেখানে জীবন মানেই যুদ্ধ। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের যুদ্ধ। ৪ বছর অতিক্রম হওয়া সত্ত্বেও সংকট সমাধানের ক্ষীণ আশাও দেখছেন না গৃহযুদ্ধ পীড়িত দেশটির জনগণ।

জাতিসংঘের হিসাবমতে, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে এ পর্যন্ত ২ লাখ ২০ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন আরও অন্তত ৭০ লাখ। বিভিন্ন দেশে শরণার্থীর জীবন কাটাচ্ছেন তারা। শিক্ষাহীনভাবে বেড়ে উঠছে শিশুরা। দারিদ্র্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে তাদের জীবন। বিশ্ব দাতা সংস্থাগুলো বলছে, সংকট নিরসনে জাতিসংঘ পুরোপুরি ব্যর্থ। খুবই স্বাভাবিক। একটি জাতি যখন নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নেয়, একে অপরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার প্রতিজ্ঞা করে তখন সে জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংসের পথ থেকে ফেরানোর সাধ্য কারও থাকে না।

সিরিয়ার এই ধ্বংসলীলা কীভাবে শুরু হয়েছিল? মধ্যপ্রাচ্যে গণতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে গড়ে ওঠা কথিত আরব বসন্ত আন্দোলনের রেশ ধরে সিরিয়ার সরকারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে পশ্চিমা মদদপ্রাপ্ত বিরোধী পক্ষ। বিরোধীরা ক্রমেই উগ্রপন্থার দিকে অগ্রসর হলে সরকারও ক্রমশ কঠোরতা প্রদর্শন করতে থাকে। এক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের উপর অস্ত্র ব্যবহার করতে বাধ্য হয় সরকার। দমননীতি গ্রহণের স্বাভাবিক পরিণতিই হচ্ছে সহিংসতা বৃদ্ধি। মুহূর্তের মধ্যে গণজাগরণমূলক আন্দোলনটির সঙ্গে সরকার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সুযোগ পেয়ে বিদ্রোহীদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা দিতে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের দেশগুলি এবং মধ্যপ্রাচ্যের

আরব রাষ্ট্রগুলো। শুরু হয় ধ্বংসের পথে হতভাগা সিরীয়দের রক্তাক্ত যাত্রা।

মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী দেশ ইরাক। সাম্রাজ্যবাদের নির্মম আঘাতের দগদগে ঘা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল দেশটি। কিন্তু অনৈক্য, শিয়া-সুন্নি সংঘাত এবং সাম্রাজ্যবাদের কূটচাল ধ্বংসপ্রাপ্ত সিরিয়ার পাশে দাঁড় করাল ইরাককেও। আবারও পশ্চিমাদের পদতলে দলিত হবার পথে এগোচ্ছে দেশটি। এদিকে লিবিয়ার অবস্থাও ভয়াবহ। আরব বসন্তের রেশ ধরে সেখানেও সরকারবিরোধী গোষ্ঠী গাদ্দাফী সরকারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিলে সরকার অস্ত্রের ভাষায় তার জবাব দেয়। আর সেই সুযোগে বিরোধীদের হাতে অস্ত্র উঠিয়ে দেয় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা। শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। গাদ্দাফী সরকার উৎখাত হয়, কিন্তু যুদ্ধ থেমে থাকে না। বর্তমানে লিবিয়ায় কোনো প্রতিষ্ঠিত সরকার নেই। একেক অঞ্চল শাসন করছে একেক গোষ্ঠী। সারাক্ষণ গুম, খুন, বোমা হামলা, অপহরণের আশঙ্কায় তটস্থ থাকতে হচ্ছে দেশটির সাধারণ জনগণকে। লিবিয়ার মানুষের জন্য পশ্চিমাদের উতলে পড়া দরদ আজ উবে গেছে। তারা এখন ভুলেও লিবিয়ার কথা মুখে আনে না। বস্তুত দীর্ঘদিনের জমে থাকা জাতীয় অনৈক্য, মানুষের তীব্র সরকারবিরোধী মনোভাব এবং ঐক্য গঠনের পরিবর্তে সরকারি দমন-পীড়নই লিবিয়ার এ দুর্দশার জন্য দায়ী।

জাতীয় অনৈক্যের পরিণতিতে ভ্রাতৃঘাতী লড়াই এবং পশ্চিমাদের স্বার্থ উদ্ধারের এই স্রোতে সর্বশেষ গা ভাসিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী দেশ ইয়েমেন। দেশটির সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী মতাদর্শীদের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ চূড়ান্তভাবে যুদ্ধের সূচনা করেছে। পশ্চিমা জোট দেশটির ভাগ্য নিয়ে নতুন খেলা আরম্ভ করেছে। আর সে খেলায় ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করছে সৌদি আরবসহ পশ্চিমা কৃপাভাজন আরব রাষ্ট্রগুলো। সব মিলিয়ে ইয়েমেন পরিণত হতে যাচ্ছে নতুন সিরিয়া, লিবিয়া, ইরাক বা আফগানিস্তানে। বিশ্লেষকরা এই সব কিছুর জন্য দেশটির বহু বছর ধরে লালিত জাতীয় অনৈক্য, ঐক্যপ্রচেষ্টায় উদাসীনতা, এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে দমন-পীড়ন-নির্যাতন এবং পশ্চিমা ষড়যন্ত্রকে দায়ী করছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের এই ঘটনাপুঞ্জি থেকে আমাদেরকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশেও আজকে কথিত গণতন্ত্রের দাবিতেই সরকারবিরোধীরা আন্দোলন করে যাচ্ছে। তাদের আন্দোলনও বিভিন্ন সময় নাশকতায় রূপ নিচ্ছে। হতাহত হচ্ছে শত-সহস্র নিরীহ-নিরপরাধ সাধারণ মানুষ। চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে সহিংস সরকারবিরোধী আন্দোলনে শুধু আগুনে পুড়েই নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছে একশ'রও বেশি মানুষ। জীবন্ত দগ্ধ হয়ে হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে কাতরাচ্ছে অনেকেই। আর সরকার যথারীতি সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কঠোরহস্তে বিরোধীদের দমনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। গণপিটুনি ও ক্রসফায়ারের নামে চলছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। কেউ কাউকে এতটুকু ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। কেউ উগ্রতা দেখায় গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, কেউ দেখায় জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। উভয়ই চলে জনতার নামে। সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বর্তমানে বিরোধীপক্ষটি সহিংস কর্মসূচি থেকে বিরত রয়েছে, কিন্তু তার মানেই এই নয় যে, সকল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ভুলে গেলে চলবে না বাংলাদেশের এই সহিংসতা সংঘটনকারী দলগুলোকে পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমা রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলো।

সিরিয়া, ইরাক বা ইয়েমেনের সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য হচ্ছে আমাদের এখানে সহিংসতার পটভূমি রচিত হয়েছে রাজনীতিকে ঘিরে, ধর্মীয় বিষয় এখানে মুখ্য নয়। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ইস্যুকে ধর্মীয় ইস্যুতে কনভার্ট করতেও খুব বেশি কাঠখড় পোড়াতে হবে না। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, শাহবাগ আন্দোলন ও হেফাজতে ইসলামের আত্মপ্রকাশ, আস্তিক-নাস্তিক বিরোধ এবং ক্রমাগত নাস্তিক ব্লগার হত্যার মতো ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, বিভিন্ন রাজনীতিক ইস্যুর পাশাপাশি বাংলাদেশে ধর্মীয় ইস্যুও সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো ভেতরে ভেতরে ক্রিয়াশীল আছে, যা যে কোনো সময় যে কোনো দিকে প্রবাহিত হতে পারে।

আজ আমাদের রাজনীতিকরা এক অশুভ দানবের ইশারায় ক্রীড়নক হয়ে খেলছেন মাত্র। জাতির ভবিষ্যতকে তারা কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন সে দিকে কোনো খেয়াল নেই তাদের। আজ যদি এই রাজনীতিবিদ, সুশীল সমাজ, পাশাপাশি সর্বস্তরের জনগণ নিজেদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এতটাই অপরিণামদর্শী থেকে যান, দেশের স্বার্থ চিন্তা না করে কেবলই নগদ স্বার্থের হিসাব করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমাদেরও কেউ একজন সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলার ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে মারওয়ান কাবালানের ন্যায় বলবেন, "আমরা কেউই আসলে ভাবতে পারিনি এ সংকট আমাদের আজকের এই মহাবিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে নিয়ে আসবে। আজ এখান থেকে উত্তরণের কোনো আশার আলোই আর নেই।"

লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট